দস্যু বনহুর

১৯-২০

দুই খন্ড একত্রে

অন্ধ মনিরা
প্রেত আত্মা

রোমেনা আফাজ

রনি

অন্ধ মনিরা-১৯
প্রেত আত্মা-২০

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

নতুন সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং

মূল্য ঃ ৫০·০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি, কে, দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০।

আমার প্রান প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

মামীমা, আমি জানি সে বন্দী হয়নি। সে এসেছিলো— আমি তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। মামীমা আমি শুনতে পেয়েছি তার কণ্ঠস্বর। আমার মনে যে গেঁথে রয়েছে সেই আওয়াজ। সে ছাড়া আর কেউ নয়, মামীমা..........

মরিয়ম বেগম বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলেন— নিষ্ঠুর এলোই যদি তবে পরিচয় না দিয়ে চলে গেলো কোনো? ওর প্রাণ কি একটুও কাঁদেনি? ঐ হতভাগার জন্য আর তোর এ অবস্থা। পাষণ্ড তোকে......

মামীমা, সে পাষণ্ড নয়, সে নিষ্ঠুর নয়— নিরুপায় হয়েই গেছে ও। জানোনা, তাকে গ্রেফতারের জন্য অহরহঃ পুলিশ সতর্ক পাহারা দিচ্ছে? পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলোনা মামীমা। ডাক্তারের সহকারীর রূপ নিয়ে কৌশলে সে এসেছিলো আমাদের সন্ধান নিতে! পরিচয় দেবার সুযোগ তার হয়নি। মনিরা কথাগুলো বলতে গিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠছিলো।

মরিয়ম বেগম সস্নেহে মনিরার পিঠে হাত রেখে বললেন— মা মনিরা তোর এই অবস্থার জন্য আমিই দোষী— আমিই দায়ী। আজ যদি ওর সঙ্গে তোর বিয়ে না দিতাম তাহলে আজ তুই অন্ধ হতিস না মা, অন্ধ হতিস না.......

মামীমা, এ সব তুমি বলছো? ওকে পেয়ে আমি নিজকে ফিরে পেয়েছি, মামীমা। আমার নারীত্ব সার্থক হয়েছে। অন্ধ হলেও আমার সান্তনা— আমি যার স্ত্রী সে সাধারণ মানুষ নয়, সে অসাধারণ পুরুষ। বলো— বলো মামীমা, কোন নারী এমন স্বামী পেয়ে অসুখী হবে? আমার কিছু না থাক, তবু খোদা ওকে মঙ্গলে রাখুন। এই দোয়া তুমি আমাকে করো মামীমা, আমি যেন তার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলেন সরকার সাহেব, চোখে-মুখে তার খুশীর উচ্ছাস, দক্ষিণ হস্তে কান্দাই পত্রিকা। আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললেন তিনি— বেগম সাহেবা, দেখুন এই দেখুন------ পত্রিকা খানা এগিয়ে দেন সরকার সাহেব বেগম সাহেবার হাতে।

মরিয়ম বেগম পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে দৃষ্টি বুলান, তাঁর চোখে সব ঝাপসা লাগে। চশমা ছিলনা— সে খেয়াল নেই। এবার বলেন তিনি— সরকার সাহেব, আপনি পড়ুন, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

সরকার সাহেব পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন—

"গতকল্য সোমবার ভোর রাত্রিতে কান্দাই শহরে

চৌধুরী মাহমুদ খান সাহেবের বাড়ীর পিছন হইতে পুলিশ বাহিনী দস্যু বনহুর ভ্রমে যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে সে ব্যক্তি দস্যু বনহুর নহে।

রাত্রির অন্ধকারে তাহোকে পুলিশ চিনতে পারেনি।

অদ্য পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী

হাঙ্গেরী কারাগারে গমন করিয়া বন্দীকে সনাক্ত

করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যাহাকে দস্যু বনহুর বলিয়া গ্রেফতার করা হইয়াছে, সে কান্দাই শহরের কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি।"

মনিরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো— মামীমা, আমি বলেছিলাম—সে গ্রেফতার হয়নি। গ্রেফতার সে আর হয়নি।

মরিয়ম বেগমের চোখে-মুখে আনন্দদ্যুতি ফুটে উঠলো। এতক্ষণে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হলেন। উপরের দিকে হাত দুটি তুলে ধরে বললেন— পাক পরওয়ার দেগার, তুমি আমার মনিকে রক্ষা করেছো। তুমিই তাকে হেফাযতে রেখো।

মাতৃহৃদয়ে অভূতপূর্ব পুত্রস্নেহ জেগে উঠলো তিনি দুচোখ মুদিত করে কিছু ভাবতে লাগলেন। হয়তো তার মনের আকাশে ভেসে উঠেছে পুত্রের মুখখানা। অনাবিল একটা শান্তির ধারা তাঁর সমস্ত অন্তরকে প্লাবিত করে দিলো।

একটু পূর্বেই যে পুত্রকে মরিয়ম বেগম তিরস্কার করছিলেন, যার জন্য তাঁর মনে সদাসর্বদা তুষের আগুন জ্বলছিলো, এক্ষণে সেই পুত্রের কুশল-সংবাদে খুশীতে ভরে উঠলো মাতৃহৃদয়। মনির তাহলে পুনঃ গ্রেফতার হয়নি নিশ্চয়ই সে ভাল আছে— কুশলে আছে।

এখানে মাতা যখন পুত্রের মঙ্গল চিন্তায় আত্মহারা, তখন নিজ আস্তানায় দস্যু বনহুর তার দুগ্ধ-ফেননিভ শুভ্র বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

কান্দাই পর্বতের কন্দরে ভূগর্ভে দস্যু বনহুরের আস্তানা।

সূর্যের আলো এখানে প্রবেশ করতে সক্ষম নয়। অহরহ বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা এখানে। কৌশলে হাওয়া প্রবেশের পত তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। সময় নির্দ্ধারণের জন্য আস্তানায় বিভিন্ন স্থানে দেয়ালে ঘড়ি টাঙ্গানো রয়েছে।

নূরী দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো, বেলা দশটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে— এখনও বনহুরের নিদ্রা ভাংলোনা।

নূরী সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, আশেপাশে কাউকে না দেখতে পেয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চললো বনহুরের কক্ষের দিকে।

অতি সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো।

শয্যায় নিদ্রামগ্ন বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো, মুগ্ধ নয়নে সে দেখতে লাগলো বনহুরকে। আজ থেকে কত বছর সে দেখে আসছে ঐ মুখখানা, কিন্তু আজও নূরীর তৃপ্তি হয়না। যত সে দেখে ততই ইচ্ছা হয় আরও তাকিয়ে থাকতে— আশা যেন মেটেনা নূরীর।

নূরী এক্ষণে বনহুরকে জাগাতে এসেছিলো, কিন্তু পারলোনা। চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো। স্মরণ হতে লাগলো গতকালকের বনহুরের কথাগুলো— কি অন্যায় আমি করেছি, বলো—জবাব দাও নূরী?

অন্যায় তুমি করোনি, করেছি আমি।

নূরী।

হুর, তুমি আমাকে স্পর্শ করোনা।

কেনো?

না না, বলতে পারবোনা, বলতে পারবোনা সে কথা আমি।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নিয়েছিলো কাছে, গভীর আবেগে বলেছিলো সে— বলতে হবে তোমাকে।

সে কথা না শোনাই তোমার পক্ষে মঙ্গল বনহুর।

নূরী, তুমি আমার কাছে কিছু গোপন করবেনা, আমি সেই আশাই করি।

হুর, জানো তোমার—আমার মধ্যে কত বড় বাধার প্রাচীর রয়েছে?

বাধার প্রাচীর?

হাঁ, আমাদের মুসলমান ধর্মে যতক্ষণ না লোকসমাজে অনুষ্ঠান করে বিয়ে হয় ততক্ষণ.....

হঠাৎ বনহুর তখন আনমনা হয়ে পড়েছিলো, অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করেছিলো। নূরীকে বাহুর মধ্যে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো সে, কিন্তু পরক্ষণেই নূরী অনুভব করেছিলো— বনহুরের হাত দু'টি ধীরে ধীরে যেন শিথিল হয়ে এলো।

নূরীকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে বলেছিলো— তুমিও কি সমাজ আর অনুষ্ঠান মানো নূরী?

নূরী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলো— আমি না মানলেও নিয়ম মেনে চলাই শ্রেয়।

তাই বুঝি তুমি কাল পালিয়েছিলে আমার কাছ থেকে? হাঁ! গলাটা কেঁপে গিয়েছিলো নূরীর।

বনহুর হেসে বলেছিলো— বাধা-বন্ধনহীন বনহুর কোন নিয়মের দাস নয় নূরী।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠেছিলো নূরী—বনহুর।

না, সেই নামে ডাকো, তোমার মুখে ঐ দু'টি অক্ষরে নামটা শুনবার জন্য আমি সর্বদা ব্যাকুল থাকি নূরী। বনহুর গভীর আবেগে নূরীকে টেনে নিয়েছিলো আবার বুকের মধ্যে।

নূরীর শিরায় শিরায় বয়ে গিয়েছিলো সুষমামন্ডিত এক অনুভূতি। কিছুতেই সে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেনি দস্যু বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন থেকে।

সব কথাগুলি এখন নূরীর মনের মধ্যে তোলপাড় করছিলো। সমস্ত অন্তরের কানায় কানায় অনুভব করছিলো সে বনহুরের হৃদয়ের অভূতপূর্ব এক আকর্ষণ।

নূরী মন্থর পদক্ষেপে বনহুরের শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দক্ষিণ হাতখানা রাখলো সে বনহুরের চুলে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেংগে গেলো বনহুরের। চোখ মেলে নূরীকে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাশ ফিরে শুলো, কোন কথা বললোনা।

নূরী বুঝতে পারলো— বনহুর অভিমান করেছে। একটু দুষ্টামি করতে ইচ্ছা হলো তার। বললো নূরী—' ভোর হতে এখনও ঢের বাকী, তুমি ঘুমাও। আমি চললাম ......

নূরী বেরিয়ে যাওয়ার ভান করলো, কিন্তু লুকিয়ে পড়লো খাটের আড়ালে।

বনহুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিছানায় উঠে বসলো। মনে করেছে বনহুর নূরী বেরিয়ে গেছে।

শয্যা ত্যাগ করবে, এমন সময় তাকিয়ে দেখলো— খাটের পাশে তার জুতোটা নেই! একটু কিছু চিন্তা করে খালি পায়েই উঠে দাঁড়ালো— কি! আলনায় তার জামাও নেই, তাকালো ওদিকে— গামছা বা তোয়ালেও নেই। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সম্মুখের আয়নায়। আয়নার মধ্যে দেখতে পেলো— খাটের পিছন দিকে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে নূরী। বনহুর এবার বুঝতে পারলো—সব দুষ্টামি নূরীর। মনে মনে হাসলো সে।

বনহুর এবার বাথরুমে প্রবেশ না করে খাটেই উঠে বসলো তারপর আপন মনে বললো— আমার জুতো, তোয়ালে, ব্রাস— সব প্রাতঃভ্রমণে গেছেন, ফিরে আসুন তাঁরা —ততক্ষণ আর একটু ঘুমিয়ে নিই।

বনহুর সত্যি সত্যি চাদর টেনে শুয়ে পড়লো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো জোবাইদা, সর্দারকে তখনও ঘুমাতে দেখে ডাকলো—সর্দার!

বনহুর এবার ফিরে তাকাতে বাধ্য হলো, শয্যায় উঠে বসে বললো—জোবাইদা, আমার ঘরে কি চোর প্রবেশ করছিলো?

অবাক কণ্ঠে বললো জোবাইদা— চোর।

হাঁ, আমার জুতো, তোয়ালে, ব্রাস কিছুই দেখছিনা।

সর্দার!

আমার মনে হচ্ছে, চোর প্রবেশ করেছিলো।

অসম্ভব। এখানে কি করে চোর প্রবেশ করবে, সর্দার?

এই দেখো আমি চোরকে তোমার সম্মুখে হাজির করছি। বনহুর খাটের ওপাশে গিয়ে নূরীর হাত ধরে টেনে তুললো।

সঙ্গে সঙ্গে জোবাইদার মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো। এতো করে বলা সত্ত্বেও আবার সর্দারের কক্ষে নূরী এসেছে।

বনহুর নূরীর হাত থেকে জুতো নিয়ে পায় পরলো আর তোয়ালেটা হাতে নিয়ে হেসে বললো বনহুর— এবার চোখের সাজা কি জানো?

জোবাইদা গম্ভীর কণ্ঠে বললো—সর্দার।

জোবাইদার কণ্ঠস্বরে বনহুর অবাক হয়ে তাকালো তার মুখের দিকে।

জোবাইদা বললো এবার— সর্দার নূরীর স্পর্দ্ধা দিন দিন চরমে উঠেছে। নূরীর অসংযত ব্যবহার আমাদের সকলের মনে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে, আমরা তাকে ক্ষমা করবো না।

জোবাইদার দৃঢ় কণ্ঠে বনহুর বিস্মিত হলো।

নূরী আর জোবাইদা সমবয়সী, আস্তানায় তারা সব ব্যাপারে সমান অধিকারী। নূরী যেমন দস্যু কালু খাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচর— কন্যা, তেমনি জোবাইদা ও নাসরিনও। বনহুরের সমবয়সী এরা না হলেও কয়েক বছরের ছোট হবে।

বনহুর যুবক। নূরী, নাসরিন, জোবাইদা— এরাও যুবতী। বনহুরের খেলার সাথী শুধু নূরী একাই ছিলনা, নাসরিন আর জোবাইদাও সহচরী ছিলো বনহুরের অবশ্য বনহুর আর নূরীর মধ্যে যেমন গভীর একটা যোগাযোগ ছিলো ততটা ছিলোনা জোবাইদা আর নাসরিনের মধ্যে।

বনহুর আর নূরী যখন এক সঙ্গে খেলা করতো, ঘুরে বেড়াতো, বনে বনে জীবজন্তু শিকার করতো, তখন জোবাইদা আর নাসরিন তাদের সঙ্গী হতে পারতো না। দূর থেকে দেখতো আর বলতো— ওরা দু'জন বড্ড স্বার্থপর। রাগ করতো, খেলা করতে যেতোনা আর তাদের সঙ্গে!

কিন্তু সদা হাস্যময়ী নূরীর কাছে বেশীক্ষণ জোবাইদা আর নাসরিন অভিমান করে থাকতে পারতোনা। ওদের হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতো বনহুরের পাশে।

বনহুর তীর-ধনুক দিয়া গাছ থেকে ফল পেড়ে দিতো— যেটা চাইতো।

নূরী, জোবাইদা আর নাসরিন হাততালি দিয়ে হাসতো, বাহাদুর বলে আখ্যা দিতো ওরা বনহুরকে।

বনহুর আর ওরা তিন জন নদীতে সাঁতার দিতো—কে আগে ওপারে যেতে পারে। সবাইকে ছাড়িয়ে বনহুর ওপারে গিয়ে উঠলো, তখন নূরী, নাসরিন আর জোবাইদা নদীর মাঝখানে পড়ে রয়েছে।

কোন কোন দিন বনহুর ফিরে এসে এদের এক এক জনকে নিয়ে যেতো ওপারে।

তিন সখী মিলে হাসিতে ভরে উঠতো।

বনহুর নুরীর হাত ধরে বলতো— চলো আমরা দু'জন সাঁতার দি।

নূরী আর বনহুর আবার নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

জোবাইদা আর নাসরিন তাকিয়ে থাকতো। খিলখিল করে হাসতো নাসরিন, জোবাইদা মুখ ভার করে থাকতো অভিমানে।

নূরীর দিকে বনহুরের যে একটা আকর্ষণ ছিলো এটা অনেক পূর্ব হতেই জানতো জোবাইদা আর নাসরিন। নাসরিনের মনে ব্যাপারটা তেমন দাগ কাটতোনা, যেমন করে জোবাইদার হৃদয়ে আঘাত করতো ওদের দু'জনার মিলামিশাটা।

বনহুর জোবাইদা আর নাসরিনের সঙ্গে গভীরভাবে না মিশলেও জোবাইদার সমস্ত হৃদয় জুড়ে রেখাপাত করেছিলো বনহুর। ওকে নিয়ে জোবাইদা মনে মনে একটা কল্পনার জাল বুনতো—স্বপ্নের রঙ্গিন নেশার মতই। কিন্তু কোন দিন জোবাইদার আশা পূর্ণ হবার নয়, একথাও সে জানতো এবং জানতো বলেই তার হৃদয়ের নিভৃত কোণে মঝে মাঝে উঁকি দিতো একটা ঈর্ষান্বিত ভাব।

জোবাইদা তার অন্তরের গোপন বাসনা কোনদিন কারো কাছে প্রকাশ করেনি বা করবার সাহসী হয়নি। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মধ্যে একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিলো যা তাকে ভাবগম্ভীর করে তুলেছিলো। শুধু জোবাইদা কেনো, আস্তানার সকলেই বনহুরের কাছে সংকুচিত হয়ে পড়তো—মুখ তুলে কথা বলতে সাহসী হতোনা কেউ।

জোবাইদা সমস্ত অন্তর দিয়ে বনহুরকে কামনা করে এলেও তাকে জানাতে পারেনি কোন দিন সে মনের কথা। সে সুযোগও আসেনি কোন দিন তার ভাগ্যে।

যখনই জোবাইদা বনহুরের সান্নিধ্য লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে, অন্তরের আকর্ষণ ছুটে গেছে সে, কিন্তু দেখেছে ওদের দু'জনাকে—বনহুর আর নূরী পাশপাশি বসে কথা বলছে বা হাসছে কিংবা দু'জন তাকিয়ে আছে দু'জনার দিকে। কতদিন দেখেছে জোবাইদা— বনহুরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে নূরী। হয়তো বা বনহুর ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এ দৃশ্য জোবাইদার মনে আগুন ধরিয়ে দিতো। সকলের অজ্ঞাতে অধর দংশন করতো সে, কিন্তু কি করবে—নীরবে সয়ে যেতো একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে ত্যাগ করে।

বনহুর আর নূরীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আস্তানার সবাই স্বাভাবিক মনে করলেও জোবাইদা এটা মেনে নিলোনা, সে গোপনে গুমড়ে মরতো।

বনহুর যখন তাদের সর্দার পদে অধিষ্ঠিত হলো—সে আজ দশ বছর আগের কথা। বনহুরের বয়স তখন আঠার বছর, তরুণ যুবক সে। বয়স কচি হলেও তার সুন্দর দেহে বলিষ্ঠতার ছাপ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছিলো মুখমণ্ডলে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ।

দস্যু কালু খাঁ তখন কার্যক্ষম না হলেও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বয়স বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে মনেও এসেছিলো ভাটা, হঠাৎ কখন কি হয় না হয়—মানুষের জীবন পদ্মপত্রে নীরের মত। কাজেই কালু খাঁ বনহুরকে যে উদ্দেশ্যে গড়ে তুলছিলো—নিজের মনোমত করে, সেই উদ্দেশ্য সফল আশায় উন্মুখ হয়ে উঠলো। একদিন সমস্ত অনুচরদের ডেকে কালু খাঁ বনহুরকে তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলো।

সেদিনের কথা আজও মনে আছে জোবাইদার।

সমস্ত আস্তানায় একটা আনন্দের উৎস বয়ে গিয়েছিলো—দস্যু কালু খাঁর অনুচরগণ সসম্মানে গ্রহণ করেছিলো তাদের তরুণ সর্দার দস্যু বনহুরকে।

সব জেবাইদার মনে গাঁথা হয়েছিলো থরে থরে সাজানো মুক্তার মালার মত একটি পর একটি করে।

বনহুর সর্দার হবার পর আস্তানার সবাই তাকে সর্দার বলে সম্মান করতো। শুধু সম্মানই নয়—ভয়ও করতো সবাই তাকে। দস্যু কালু খাঁ বনহুরকে সর্দারের উপযুক্ত হিসাবেই তৈরী করে নিয়েছিলো।

একদিন নয়—বনহুর দস্যু কালু খাঁকে তিনবার পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলো অস্ত্রযুদ্ধে।

কালু খাঁ সেদিন তরবারী নিক্ষেপ করে বনহুরকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো, আনন্দ ভরা কণ্ঠে বলেছিলো—সাবাস!

গর্বে স্ফীত হয়ে উঠেছিলো কালু খাঁর বুক। হৃদয়ের অফুরন্ত উচ্ছাস ফুটে উঠেছিলো তার দু'টি চোখে।

একটু দূরেই অন্যান্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো জোবাইদা, নাসরিন আর নূরী। সকলেরই মুখভার খুশী উচ্ছ্বাসে ভরপুর।

বনহুর ছুটে এসে নূরীর হাত দুটি চেপে ধরে বলেছিলো— নূরী, আমি সাফল্য লাভ করেছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে জোবাইদার মুখ কালো হয়ে উঠেছিলো। এতোগুলি প্রাণী তারা দাঁড়িয়ে, অথচ বনহুর তার আনন্দ বার্তা জানালো। দারুণ একটা অভিমান ভরে উঠেছিলো সেদিন তার মনে। আর দাঁড়াতে পারেনি সরে গিয়েছিলো জোবাইদা সেখান থেকে।

আজ জোবাইদার মনে সেই ক্ষোভ দানা বেঁধে বেঁধে জমাট হয়ে উঠেছে। ঈর্ষা পরিণত হয়েছে হিংসায়। মনোভাব প্রকাশ না করলেও সে কিছুতেই নিজকে সচ্ছ রাখতে পারছিলোনা। আজ থেকে দশটি বছর সে নীরবে সহ্য করে এসেছে, বনহুর আর নূরীর মধ্যে গভীর একটা যোগাযোগের তীব্র জ্বালা তার হৃদয়কে দগ্ধীভূত করে দিয়েছে। জোবাইদা এখন তার অন্তরের ব্যথায় জুড়াতে চায়, বনহুর আর নূরীকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে তার যেন স্বস্তি হচ্ছে না।

তাই সে আস্তানায় গোপনে এ সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে। ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করে সবাইকে। এমন কি তাদের বৃদ্ধা দাইমাকেও এ বিষয় নিয়ে উত্তেজিত করে জোবাইদা।

সেদিন যখন জোবাইদা নূরীকে এই কথা নিয়ে বলেছিলো— নূরী, সর্দারকে বলো কলেমা পাঠ করে বিয়ে করতে, না হলে তোমাদের এ মেলামেশা শুধু পাপ নয় জঘন্য।

কিন্তু নূরী জানিয়েছিলো বনহুরের সঙ্গে তার এমন কোন অস্পৃশ্য সম্বন্ধ ঘটেনি যা তাদের জীবনকে কুলষিত করে তুলতে পারে।

সেদিন আরও বলেছিলো নূরী— বনহুর শুধু পবিত্রই নয়— নির্মল, নিষ্পাপ.......

কথাটা জোবাইদার মনে মুহূর্তের জন্য একটা সান্ত্বনার খোরাক বয়ে এনেছিলো বটে কিন্তু স্থায়ী হয়নি বেশীক্ষণ। অবিশ্বাসের স্রোত ভেসে গিয়েছিলো নূরীর উক্তিগুলো। যার সঙ্গে এতো নিবিড় ঘনিষ্ঠতা, যার সঙ্গে এতো ঐকাত্ম্য কি করে বিশ্বাস করবে জোবাইদা তার কথা। বনহুর সৌম্য-সুন্দর বলিষ্ঠ পুরুষ আর নূরী সুন্দরী চঞ্চলা যুবতী। কিছুতেই জোবাইদা বিশ্বাস করতে পারে না, ওদের মধ্যে নেই কোন অবৈধ সম্বন্ধ।

জোবাইদা চায় নূরী থেকে সরে থাকবে বনহুর—যেমন রয়েছে তাদের সান্নিধ্য থেকে অনেকে দূরে। শত আরাধনা করেও কোন দিন তারা বনহুরের পদ স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। জোবাইদার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলো আজ বনহুর, আর বিস্মিত হয়েছিলো তার কণ্ঠস্বরে। বনহুরের কানে বার বার প্রতিধ্বনি হচ্ছিলো জোবাইদার দৃঢ় কণ্ঠের উক্তিগুলি....... সর্দার, নূরীর স্পর্দ্ধা দিন দিন চরমে উঠেছে। নূরীর অসংযত ব্যবহার আমাদের সকলের মনে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। আমরা তাকে ক্ষমা করবো না...... আমরা তাকে ক্ষমা করবো না.... আমরা তাকে ক্ষমা করবো না। .....

বনহুর ধীর কণ্ঠে বললো— নূরীর অপরাধ?

জোবাইদা কোন জবাব দিতে পারলোনা, একবার চোখ তুলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর মেঝেতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো—জোবাইদা।

বলো নূরীর অপরাধ কি?

সর্দার, আমি দাইমাকে ডেকে আনছি সেই বলবে। না, তোমাকেই বলতে হবে।

আর একবার জোবাইদা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে নিলো বনহুর আর নূরীকে।

ঠিক্ সেই সময় কক্ষে প্রবেশ করলো বৃদ্ধা দাইমা!

বনহুর ফিরে তাকিয়ে তাকে একবার দেখে নিলো।

দাইমা বললো এবার— বনহুর, তুমি এখন আমাদের সর্দার—দলপতি। বাবা, তোমাকে আস্তানার সবাই যেমন সম্মান করে তেমনি করে ভয়। সবাই—চায় তাদের সর্দার হবে সবদিকে আদর্শ সত্যবান.......

জোবাইদা যা বলতে চাচ্ছিলো , শুনতে চাই।

সে কথা আমি বলবো বাবা।

তবে ভূমিকা না করে বলো। আমি সর্দারের যোগ্য নই?

না, সে কথা না বনহুর।

ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকায় বনহুর দাইমার মুখের দিকে।

দাইমা বলে এবার—-বনহুর, তোমার বয়স হয়েছে, নূরীও এখন বয়স্কা যুবতী। তোমার আর নূরীর মধ্যে মিলামিশা নিয়ে একটা -----

থেমে পড়ে দাইমা, বনহুরকে সেও ভয় করতো ভীষণভাবে।

বনহুর অবশ্য কোন দিন দাইমাকে অশ্রদ্ধা করেনি বা কঠিন কথা বলেনি।

দাইমা কালু খাঁর এখানে দাসী হিসাবেই এসেছিলো। প্রচুর অর্থের লোভেই সে এসেছিলো, সেকথা অবশ্য মিথ্যা নয়।

কিন্তু বনহুর দাইমাকে কোন হীন বা তুচ্ছ নজরে দেখেনি। বনহুর নিজেও বৃদ্ধাকে দাইমা বলে ডাকতো, অন্য সবাই তাকে দাই-ই বলতো।

বনহুর দাইমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেও দাইমা কোনদিন বড় একটা বনহুরের সামনে আসতো না। অবশ্য এটা দাইমার নিজস্ব মনোভাব। বনহুর এখন সর্দার, কাজেই দাইমাও তাকে সমীহ করে চলতো।

দাইমা থেমে পড়তেই বনহুর বললো— কানাঘুষা চলছে।

হাঁ বাবা।

সে জন্য কি নূরী অপরাধী?

জোবাইদা আবার চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য হলো।

দাইমা কি বলবে ভাবছে বোধ হয়।

বনহুর এবার গর্জন করে উঠলো— নূরীর সঙ্গে আমার মিলামিশা যদি দোষণীয় হয়ে থাকে সে জন্য নূরী দায়ী নয়, দায়ী আমি.... কারণ নূরীকে আমিই প্রশ্রয় দিয়েছি, আমিই মিশেছি তার সঙ্গে অপরাধ যদি থাকে সেজন্য আমিই অপরাধী— নূরী নয়। বিচার যদি চাও আমাকে দণ্ড দেবে, আমি তোমাদের দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করবো। কিন্তু এর পর যদি দ্বিতীয় বার নূরী সম্বন্ধে আমার আস্তানায় কেউ কোন কুৎসিৎ-ইংগিৎ করে, আমি তাকে আস্তানা থেকে বের করে দিতে বাধ্য হবে। ....

বনহুরের কথায় জোবাইদা ফোঁস করে উঠলো— বিষধর সর্পের মস্তবে আঘাত করলে যেমন সে ভীষণ হয়ে উঠে। জোবাইদা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে একবার নূরীর দিকে তাকালো, তারপর দ্রুত প্রস্থান করলো সে ঐ স্থান হতে।

দাইমাও ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যগ করে বেরিয়ে গেলো।

জোবাইদা আর দাইমা বেরিয়ে যেতেই, নূরী ছুটে এসে বনহুরের পায়ে পড়লো। তার অশ্রু দিয়ে সিক্ত হতে লাগলো বনহুরের পা দুটি

বনহুর ওকে তুলে নিলো গভীর স্নেহে।

নূরী বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে কেঁদে উঠলো উচ্ছসিতভাবে।

বনহুর বললো— নূরী, কেঁদো না। নিজের হাত দিয়ে ওর চোখের পানি মুছিয়ে দিতে লাগলো বনহুর।

নূরী শিশুকাল মাতৃহারা, পিতাকেও সে হারিয়েছে অতি ছোট বেলায়, এ দুনিয়ায় তার আপন বলতে কেউ নেই। দস্য কালু খানেকেই আপন জন মনে করে জানতো নূরী কিন্তু সেও যখন চলে গেলো তখন বনহুরকেই সাথী রূপে পাশে পেয়েছিলো নূরী। তারপর থেকে বনহুরই তার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা।

বনহুরের মধ্যে নিজকে বিলিয়ে দিতে পারলেই শান্তি। এ দুনিয়ায় তার কিছুই যেন কামনার নয়— একমাত্র বনহুর ছাড়া। তাই আজ নূরী বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে প্রাণ ভরে কেঁদে নিলো

বনহুর আজ বাধা দিলো না নূরীকে।

কেঁদে কেঁদে এক সময় নূরী শান্ত হয়ে এলো।

বনহুর বললো— নূরী, তুমি কারো কথায় কান দিও না। আমি তোমার, চিরদিনই তোমার থাকবো---------

হুর!

নূরী! আমার লক্ষ্মীটি।

❑

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ আহম্মদ নাসির শাহকে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি কেনো চৌধুরী বাড়ীর প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, বলুন? জবাব দিন?

পুলিশ অফিসে এক গাদা পুলিশ অফিসার ও আরও অন্যান্যদের সম্মুখে মাথা নত করে একটা চেয়ারে বসে ছিলো নাসির শাহ। চোখেমুখে তার লজ্জা-ক্ষোভ প্রতিহিংসা ফুটে উঠেছে। মুখ কালো করে বসেছিলো সে ইন্সপেক্টারের প্রশ্নে মুখ তুলে তাকালো নাসির শাহ, গম্ভীর কণ্ঠে বললো— দস্যু বনহুরকে বন্দীর উদ্দেশ্যেই আমি চৌধুরী বাড়ী গিয়েছিলাম।

অবাক কণ্ঠে বললেন মিঃ জাফরী— দস্যু বনহুরকে বন্দীর উদ্দেশ্যে আপনি চৌধুরী বাড়ীর প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন?

হাঁ, জানতাম সে ঐদিন শহরের যেখানেই থাক একবার চৌধুরী বাড়ী গমন করবেই।

হাসলেন মিঃ আহম্মদ—জানতেন না পুলিশ আপনার চেয়েও সতর্ক ও চৌধুরী বাড়ীর উপরে তাদের কড়া নজর আছে বা ছিলো?

জানতাম, তবু নিজে দস্যুকে গ্রেপ্তার করে..........

কৃতিত্ব লাভ করতে চেয়েছিলেন এই তো? মি জাফরী।

মিঃ আহম্মদ হেসে উঠলেন— সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী যাকে গ্রেপ্তারে হিমসিম খেয়ে যায় আর আপনি তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলেন অস্ত্রহীন রিক্ত হস্তে! আপনার দুঃসাহস তো কম নয়। এবার কঠিন কণ্ঠে বললেন তিনি—কেনো আপনি আজ রাতে চৌধুরী বাড়ীতে গিয়েছিলেন সত্য করে বলুন?

এবার সোজা হয়ে বসলো নাসির শাহ; দৃঢ় কণ্ঠে বললো সে-ঐশ্বর্য্য বা অর্থের লোভী আমি নই, কারণ, এসব আমার প্রচুর আছে। তাহলেই বুঝতে পারছেন, চুরি বা ডাকাতি করতে আমি যাইনি।

তাহলে কি জন্য আপনি গিয়েছিলেন—কোন্ অভিসন্ধি নিয়ে বলুন?

বললাম, আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার আশায় গিয়েছিলাম, এবং আমি রিভলভার সঙ্গে নিয়েছিলাম বটে, কিন্তু পুলিশ যখন আমাকে গ্রেপ্তার করে ফেললো তখন আমি ভয়ে রিভলভার দূরে নিক্ষেপ করেছিলাম।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ আহম্মদ আরও কিছুক্ষণ নাসির শাহকে জেরা করার পর মুক্ত করে দিলেন।

নাসির শাহ পুলিশ অফিস থেকে বেরিয়ে সহসা বাড়ী ফিরে যেতে পারলোনা, সে সোজা তার আড্ডায় গিয়ে হাজির হলো।

গত রাতের ব্যাপার নিয়ে চললো নাসির শাহ আর তার দলবলের মধ্যে গভীর আলোচনা। চৌধুরী-কন্যা মনিরাকে চুরি করতে গিয়েই তার জীবনে একটা কলঙ্কের রেখাপাত হলো। হাজত বাস নয়, একেবারে হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী হতে হলো তাকে।

ক্রুদ্ধ জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করেছিলো নাসির শাহ। দু'চোখে তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিলো। ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করছিলো আর বলছিলো সে— চৌধুরী-কন্যা মনিরাকে আমার চাই। যেমন করে হোক আমি তকে হরণ করে আনবোই আনবো। হোক সে অন্ধ, হোক সে দৃষ্টিহীন......... আমি যতক্ষণ না মনিরাকে পেয়েছি ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই, শান্তি নেই......

নাসির শাহের সাঙ্গ-পাঙ্গ অর্থলোভে সব সময় তার আসর সরগরম করে থাকতো, কাজেই কু'বুদ্ধির জন্য তাকে আর ভাবতে হতোনা। গোটাদিন ধরে চললো শারাব পান আর নানারকম আলোচনা।

❑

নাসির শাহ দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে গিয়ে বন্দী হয়েছে, কথাটা এক সময় বোন জুলেখার কানে এসে পৌঁছলো। ভাই এর জন্য সে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো, এতোবড় দুঃসাহস কি করে হলো তার—যার সব সময় নিজ স্বার্থ ছাড়া কোনদিকে তাকাবার সময় নেই, সেই ভাই গিয়েছিলো রাতের অন্ধকারে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে! সবাই বিশ্বাস করলেও জুলেখা কথাটা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারলোনা।

আজ নয়, আরও কতদিন নাসির শাহ এমনি মিথ্যা কথা বলে লোক-সমাজকে বঞ্চনা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। জুলেখা বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই কোন কু'মতলব নিয়ে সে গিয়েছিলো চৌধুরী বাড়ীতে।

অনেক রাত ধরে জেগে কাটালো জুলেখা ভাই-এর প্রতীক্ষায়। হাজার হলেও ভাইতো। মা অসুস্থ মানুষ—শাহ বাড়ীর কোন অমঙ্গল হলে সেটা সবার আগে জুলেখাকেই আঘাত করবে বেশী করে। কারণ জুলেখা এখনও অবিবাহিত; এ সংসারই তার আপন এবং নিজের।

আজকাল জুলেখা যদিও নিজের রোগী-পত্তর আর ল্যেব্রটারী নিয়ে ব্যস্ত থাকে তবুও সংসারের খোঁজ-খবরও না রেখে তার চলে না।

নাসির শাহ আজ গৃহলক্ষ্মী ঘরে আনেনি। বিয়ে করলে তার জীবনটা নাকি এক ঘেয়েমিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। তখন দূর্বিসহ জীবনটা বয়ে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে নাকি এক দূরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই নাসির শাহ নিজের জীবনটাকে সীমাবদ্ধ করতে চায় না। মুক্ত বিহঙ্গের মত এখন যে দিকে খুশী বিচরণ করে ফিরছে, তখন সেটি উপায় থাকবে না— এটাই হলো তার বিয়ে না করার একমাত্র কারণ।

জুলেখাও এ নিয়ে বড় একটা কিছু বলতোনা নাসির শাহকে—জানতো, বলে শুধু বাক্যব্যয় ছাড়া কোন ফল হবেনা। নীরব থাকাই সমীচীন মনে করতো সে।

তবু আপন সহোদর তো, জুলেখার হৃদয়ে নাসির শাহর এই অমানুষিকতা চরম আঘাত হানলেও ভিতরে ভিতরে গুমড়ে কেঁদে উঠতো তার মন। বড় ভাইটিকে সংশোধন সংকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করতো জুলেখা অন্তরাল থেকে।

কিন্তু কথায় বলে, 'কুকুর লেজে রশি বেঁধে টানলেও কোন দিন সোজা হয় না।' তাই জুলেখাও ভাইকে সৎ পথে আনবার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সর্বদিকে।

আজ যখন জুলেখা জানতে পারলো, নাসির শাহ পুলিশ হস্তে বন্দী হয়েছে, তখন তার বুকে কে যেন একটা তীর-ফলা বিদ্ধ করলো সকলের অলক্ষ্যে। জুলেখা ব্যস্ত হলো না বটে কিন্তু উদ্বিগ্ন হলো। সারাটা দিন মনোকষ্ট আর দুর্ভাবনায় কাটিয়ে দিয়ে রাতেও জেগে রইলো ভাইয়ের আগমন প্রতীক্ষায়।

❑

রাত বারোটায় ফিরে এলো নাসির শাহ—মদের নেশায় চুর চুর হয়ে। টল্‌তে টল্‌তে কক্ষে প্রবেশ করতেই জুলেখা তার সম্মুখে দাঁড়ালো, রাগত কণ্ঠে বললো সে— ভাইয়া, তুমি কি দিন দিন অমানুষ হয়ে পড়লে?

অমানুষ! কেনো?

ছিঃ তোমার সঙ্গে কথা বলাও পাপ। কি ছাই পাস্ খেয়েছো বলতো?

জুলেখা, তুই কি বুঝবি বোন! কথা বলতে বলতে ঢেকুর তুলছিলো নাসির শাহ।

জুলেখা আর দাঁড়াতে পারলোনা বা কোন প্রশ্ন তাকে করলোনা বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

শত চিন্তা করেও জুলেখা ভাইকে সৎপথে আনার কোন উপায় খুঁজে পেলোনা।

কিন্তু নাসিরের চিন্তায় বেশীক্ষণ ভাবার সময় ছিলোনা জুলেখার। তার সাধনা রোগীর সেবা করা। যত কঠিন রোগই হোক, জুলেখা চায়— সেই রোগকে তার চিকিৎসায় আরোগ্য করে তোলা।

সারাটা দিন যে সব রোগীদের মধ্যে তাকে কাটাকে হয়, রাতে শয্যা গ্রহণের পরও তাদের নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে সে। শুধু সে ডাক্তারই নয়— মানুষের বিভিন্ন শারীরিক দিক নিয়েই সে বিদেশ থেকে শিক্ষা লাভ করে ফিরে এসেছে। তার কর্তব্য দেশের জনগণকে রোগমুক্ত করা। সে যে কোন রোগই হোক তাকে সারিয়ে তোলাই তার জীবনের ব্রত।

জুলেখা যখনই তার রোগীদের নিয়ে ভাবতে বসে তখনই প্রথমে ভেসে উঠে মনিরার কথা তার মন জুড়ে। যেমন করে হোক মনিরার দৃষ্টি শক্তি তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। জুলেখা শুধু ডাক্তারই নয়— আইজ স্পেশালিষ্টও। মনিরার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে না পারলেই তার সাধনাই ব্যর্থ যাবে।

জুলেখা মনিরাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। রাতের পর রাত চক্ষু চিকিৎসা সম্বন্ধে মোটা মোটা ডাক্তারী বইগুলো নিয়ে পাতা উল্টে চলে। যেমন করে হোক মনিরাকে স্বাভাবিক করতেই হবে। গোটা রাত কাটিয়ে দেয় জুলেখা অনিদ্রায়।

মনিরা শুধু বান্ধবীই নয়, জুলেখার জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী।

জুলেখা কেনো যেন সব চেয়ে বেশী ভালবাসতো মনিরাকে যদিও মনিরা জুলেখার শিশুকালের সঙ্গী নয়। স্কুল জীবনে ওদের দু'জনার পরিচয় ঘটেছিলো, তারপর কলেজ জীবন।

মনিরা বিশ্বাস করতো যেমন জুলেখাকে, জুলেখাও তেমনি মনিরাকে নিজের জীবনের চেয়েও ভালবাসতো। মনিরার অমঙ্গল চিন্তা করতে পারতোনা কোনদিন জুলেখা। মনিরাও ছিলো ঠিক বান্ধবীর মতই, এক প্রাণ এক মন ছিলো ওদের দু'জনার।

এই ঘটনার পর কয়েকদিন কেটে গেছে। শহরবাসীদের মন থেকে দস্যু বনহুরের পলায়ন-স্মৃতি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত না হলেও একটা আতঙ্ক ভরা ভাব— যা এ ক'দিন শহরের স্বাভাবিক গতিকে অস্বাভাবিক করে তুলেছিলো, আপাতত সেটা অনেকটা কমে এসেছিলো।

শহরের যান-বাহন চলাচল এবং পথচারীদের অবাধ গতি একেবারে সচ্ছ না হলেও কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে।

পুলিশ পথে, আনাচে,-কানাচে নিয়মিত পাহারায় রত থাকলেও এ ক'দিনের মত সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে প্রতিটি নাগরিকদের লক্ষ্য করছেন না বা প্রত্যেকটি গাড়ী পরীক্ষা করে দেখেছেনা।

কারণ কান্দাই এর মত মস্ত বড় একটা শহরকে সম্পূর্ণ পুলিশের আয়ত্বের মধ্যে রেখে অনুসন্ধান চালানো কয়েক দিন সম্ভব হলেও সকল সময়ের জন্য, সম্ভব ছিলনা। শুধু পুলিশ বাহিনীই নয়, সবাই জানতে পেরেছিলো—দস্যু বনহুর এখনও শহরে বসে নাই।

নাগরিকগণ স্বাভাবিকভাবে পথ চলাচল করলেও একেবারে নির্ভয় হতে পারছিলোনা। যত কাজই থাক, তারা রাত দশটার পর আর শহরের মধ্যে আনাগোনা করতে সাহসী হচ্ছিলোনা।

রাত বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্দাই শহরে জনমুখর রাজপথ জনশূন্য হয়ে আসে। যান-বাহন চলাচল একেবারে বন্ধ না হলেও কমে আসে অনেক। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কেউ গাড়ী নিয়ে বের হতে চায় না।

দস্যু বনহুরের অন্তর্ধানের পর নগরবাসীর মনে যে একটা তীব্র আতঙ্ক ভাবের সৃষ্টি হয়েছিলো তা এখনও সমূলে নির্মূল হয়ে যায়নি।

কান্দাই শহর এখন বেশী রাত্রিতে একেবারে নিশ্চুপ নীরব হয়ে যায়। শুধু পুলিশদের হুইসেলের শব্দ আর দু'চারটি মোটরের হর্ণ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না।

সমস্ত শহর যখন সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে, পাশের কক্ষ থেকে ভেসে আসছে নাসির শাহর নেশায় ভরপুর নাসিকার গর্জন ধ্বনি। জুলেখা তখনও তার চক্ষু বিষয়ক ডাক্তারী বইগুলি নিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখে যাচ্ছিলো।

এক সময় জুলেখার আঁখি দুটি বন্ধ হয়ে আসে, নিদ্রা দেবী আসন গাড়ে তার চোখের পাতায়।

ঘুমিয়ে পড়ে জুলেখা।

চৌধুরী বাড়ীতে রাত জাগা প্রহরীর মত মনিরা বসে আছে নিজ শয্যায়। আজ নয়, সেদিনের পর থেকে মনিরার চোখের নিদ্রা অন্তর্হিত হয়েছিল চিরতরে—যেদিন মনিরা সংজ্ঞালাভের পর ক্ষণিকের জন্য শ্রবণ করেছিলো সেই দীপ্তগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

মনিরা প্রতি মুহূর্তে কামনা করে আসছে স্বামীর। দেখতে সে পায়না এখন কিন্তু কানে শুনতে পায় তো। হঠাৎ যদি এসে ফিরে যায় কিংবা আবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলে তখন চোখে না দেখলেও কানে শুনতে পাবে তো।

কক্ষ মধ্যে একটু শব্দ হলেই মনিরার চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠে। স্বর্গীয় এক প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল। ব্যাকুল কণ্ঠে কত দিন মনিরা প্রশ্ন করে বসেছে— কে, তুমি এসেছো? ওগো তুমি এসেছো?

কোন সাড়া নেই শব্দ নেই। বাতাস কখন নিঃশব্দে চলে গেছে জানালার শার্শীতে মৃদু আঘাত করে। মনিরা বিফল হৃদয়ে আবার বালিশটা আঁকড়ে ধরে। বুঝতে পারে—যার জন্য ব্যাকুল সে, তার সেই প্রতীক্ষিত ব্যক্তির আগমণ শব্দ এ নয়। মনিরার ব্যথিত হৃদয় মুষড়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে গণ্ড বেয়ে।

হঠাৎ কাঁচের শার্শীটা আবার যেন নড়ে উঠলো একটু।

এবার কিন্তু মনিরা চম্‌কালো না, যেমন বসেছিলো তেমনি রইলো। মনে করলো সে দমকা হাওয়া আবার বুঝি নাড়া দিলো কাঁচের শার্শীটায়।

পরক্ষণেই মনিরার ভুল ভেঙ্গে গেলো, এবার পূবালি হাওয়া নাড়া দেয়নি। কেউ যেন সন্তর্পণে প্রবেশ করলো জানালা দিয়ে কক্ষমধ্যে। মনিরার হৃদয়ে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস আলোড়ন জাগালো। তবে কি সে এসেছে, যার প্রতীক্ষায় মনিরা জেগে আছে আজ ক'টি রাত। কিন্তু সে তো দেখতে পায়না, বিষ পানে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। উঃ তবে কি আর কোন দিন ওকে দেখতে পাবেনা। না না, সে কি করে সহ্য করবে— কি করে সহ্য করবে এই অসহ্য অন্ধকার।

মনিরার মুখে উচ্ছ্বাসিত আনন্দের লোহরী ফুটে উঠেছে। কিন্তু মনিরা এখনও নিশ্চুপ বসে আছে খাটের উপর।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে মনিরাকে খাটে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়, কই তাকে দেখতে পেয়েও মনিরা অমন নিশ্চুপ বসে রইলো কেনো! বনহুরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো, কয়েক পা এগিয়ে কঠিন কণ্ঠে ডাকলো— মনিরা।

মনিরা স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে অধীর আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো— তুমি এসেছো! পর মুহূর্তে খাটের উপর থেকে নেমে ছুটে গেলো সে যেদিক থেকে ভেসে এসেছিলো বনহুরের গলার আওয়াজ।

কিন্তু সোফার সঙ্গে আঘাত পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে।

বনহুর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো, মনিরার আচরণে বিস্মিত হলো। একি! মনিরা তাকে দেখতে পাচ্ছেনা?

তাড়াতাড়ি মনিরাকে ধরে তুলে নিলো বনহুর।

মনিরা স্বামীর স্পর্শে আত্মহারা হয়ে পড়লো, দুই হাত দিয়ে বনহুরের বুকে-মুখে মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে বললো—তুমি এসেছো।

বিস্ময়ের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে বনহুর, কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথা উচ্চারণ হলোনা। মনিরার এই অদ্ভুত ব্যবহারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো সে। বনহুর বললো— মনিরা, তুমি এমন করছো কেনো! মনিরা..............

ওগো, আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছিনা।

বনহুর প্রায় চীৎকার করে উঠলো—মনিরা।

হাঁ, আমি অন্ধ হয়ে গেছি। আমি অন্ধ হয়ে গেছি..... স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠে মনিরা।

চিত্রার্পিতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর।

এই মুহূর্তে তার মস্তকে আকাশ ভেংগে পড়লেও বুঝি এতোখানি মর্মাহত হতোনা বনহুর।

মনিরা স্বামীর জামার আস্তিন চেপে ধরে ঝাঁকুনি দেয়— ওগো তুমি কথা বলছো না কেনো? ওগো তুমি কথা বলছো না কেনো?

বনহুরের জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। বৈচিত্রময় তার জীবনের প্রতিটি ধাপ—কিন্তু একি পরিণতি এলো তার জীবনে।

সহসা বনহুরের কণ্ঠ দিয়ে কোন কথা বের হলোনা। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললো—মনিরা, কেমন করে তোমার এ অবস্থা হলো?

মনিরা কোন কথা বললো না।

বনহুর মনিরাকে নিয়ে খাটে এসে বসলো, মনিরার মুখখানা তুলে ধরে বললো— মনিরা, কেমন করে তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হলো?

মনিরা তবু নীরব।

বনহুর ব্যাকুল কণ্ঠে বললো.. বলবেনা তুমি?

মনিরা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো— তোমার মৃত্যু সংবাদ আমার কানে পৌঁছবার পূর্বে আমি মরতে চেয়েছিলাম....

মনিরা!

আমি— আমি বিষ পান করেছিলাম।

বিষ!

হাঁ, ডাক্তার বোস নানা চেষ্টায় আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি....

বনহুর তার বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে মনিরার হাত দুটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে—এ তুমি কি করেছো মনিরা? এ তুমি কি করেছো?

ওগো, আর কোনদিন আমি তোমাকে দেখতে পাবোনা? আমার কোন আর দুঃখ নেই ব্যাথা নেই— শুধু তোমাকে দেখতে পাবোনা, এই দুঃখ আমার অন্তরটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। তোমার ঐ সৌম্য-সুন্দর দীপ্ত চোখদুটো আর আমি দেখতে পাবোনা!

বনহুর গভীর আবেগে মনিরাকে বুকে আঁকড়ে ধরে— মনিরা।

মনিরা স্বামীর মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করে তাকে।

হঠাৎ মনিরার হাত দু'খানা বনহুরের গণ্ডে পড়তেই বুঝতে পারে সে, বনহুর কাঁদছে।

মনিরা বলে উঠে— তুমি কাঁদছো।

বনহুরের চোখের পানি ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পরে মনিরার মাথায়। কেঁদোনা লক্ষ্মীটি। তোমার মনিরার আর কোন দুঃখ নেই। ব্যথা নেই, নেই

কোন অনুতাপ। জানো— আজ আমি কত সুখী------ তুমি আছো—এটাই আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য। আমি নিজে নিঃশেষ হয়ে যাবো, তবু তুমি বেঁচে থাকো.......

মনিরা, তুমি এভাবে নিজকে ধ্বংস করবে, কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। একটা দীর্ঘশ্বাস বনহুরের বুক চিরে বেরিয়ে এলো।

বনহুর বললো আবার— তোমাকে এভাবে দেখবার পূর্বে আমার মৃত্যু হলেও মঙ্গল ছিলো।

মনিরা তাড়াতাড়ি বনহুরের মুখে হাত-চাপা দিলো—না না, ও কথা বলো না। ও কথা বলোনা তুমি।

মনিরা, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলে। কেনো, কেনো তুমি বিষ পান করেছিলে মনিরা, কেনো তুমি বিষ পান করেছিলে.......

মনিরাকে বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো বললো বনহুর।

বনহুর বললো এবার— মনিরা, কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেখেছিলাম— সম্প্রতি লণ্ডন থেকে একজন মহিলা ডক্টর এসেছেন। তিনি শুধু ডাক্তারই নন একজন আইজ্‌স্পেশালিষ্টও।

হাঁ, সে আমার একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবী, নাম ওর জুলেখা।

সে তোমাকে দেখেছে?

দেখেছে। আমাকে নিয়ে সে গম্ভীরভাবে চিন্তা করেছে।

সত্যি?

আমার অন্ধত্ব বান্ধবীদের মধ্যে তাকেই বেশী আঘাত করেছে।

তাহলে.....তাহলে মনিরা তোমার বান্ধবীকে আমি নিজে অনুরোধ জানাবো। বনহুরের কণ্ঠে আকুলতা ঝরে পড়ে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে? আমার বান্ধবীকে তুমি পাবে কি করে?

মনিরা ভয় পেওনা, দস্যু বনহুরের আসল রূপ, একমাত্র মিঃ জাফরী ও মিঃ আহম্মদ ছাড়া কেউ চিনতে পারবেনা, আজ আমি ফিরে যাবোনা মনিরা।

সত্যি বলছো?

হাঁ, মনিরা।

কিন্তু

বলো?

এ বাড়ীর একমাত্র সরকার সাহেব ছাড়া তোমাকে কেউ দেখেনি কোনদিন। বাড়ীর চাকর-বাকর অন্যান্য সবাই আশ্চর্য্য হবে যে?

বলো আমার একজন বন্ধু বা আত্মীয়।

তাহলে চলো মামীমার কাছে যাই?

হুঁ এখন নয় —আরও পরে বনহুর মনিরাকে ঘনিষ্ঠভাবে টেনে নেয় কাছে।

মনিরা নিজেকে উজাড় করে দেয় বনহুরের মধ্যে।

সমস্ত কান্দাই শহর তখন ঝিমিয়ে পড়েছে। যান-বাহন চলাচলের শব্দও থেমে গেছে। পথচারীদের পদশব্দ আর শোনা যাচ্ছেনা। মাঝে মাঝে শুধু ভেসে আসছে পুলিশের বাঁশীর সতর্ক ধ্বনি। আর আকাশে জেগে আছে তারার প্রদীপ।

❑

খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলো মনিরার।

জেগেই অনুভব করলো মনিরা— তার দেহটা কোন শিথিল বাহুবন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। মনিরার অন্তরে একটা আনন্দের উৎস বয়ে গেলো। শিরায় শিরায় বয়ে গেলো তার এক জ্যোতির্ময় লহরী। মনিরা ঘুমান্ত স্বামীর হাত দু'খানা সরিয়ে দিতে পারলোনা। কত সাধনা, কত কামনার যেন ঐ বাহু দুটি। মনিরা ভাবছে— সে তো স্বপ্ন দেখছেনা, সত্যি আজ সে স্বামীর বাহুর মধ্যে শায়িতা........ মনিরা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেনা।

ধীরে ধীরে মনিরা স্বামীর বুকে-গলায় মুখে হাত বুলিয়ে অনুভব করছে— বাস্তব না কল্পনা।

বনহুরের ঘুম ভেঙ্গে গেলো, মনিরাকে আরো নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে বললো— মনিরা, কি করছো?

তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনা, তাই অনুভব করছি— সত্যি তুমি আমার পাশে আছো কি না?

মনিরা।

বলো?

আমি শপথ করছি— তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করতেও কুণ্ঠা বোধ করবোনা। আমার জীবনের বিনিময়েও আমি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে চাই মনিরা।

ছিঃ শপথ করতে নেই অমন করে।

বনহুর নীরব রইলো।

মনিরা বললো আবার—জুলেখা চোখ সম্বন্ধে ভালভাবে শিক্ষা লাভ করে এসেছে, আমার মনে হয় সে আমাকে আরোগ্য করতেআপ্রাণ চেষ্টা করবে।

আজ আমি তোমাকে নিয়ে যাবো তোমার বান্ধবীর ওখানে। যাও মনিরা, মাকে বলো সব কথা। ওঃ তুমি যাবে কি করে?

হাসলো মনিরা—অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এসো আমি মামীমাকে ডেকে আনছি।

মনিরা দেয়াল হাতড়ে এগুতে লাগলো।

বনহুর হাত ধরে এগিয়ে দিলো তাকে দরজা অবধি।

মরিয়ম বেগম নামাজ শেষে ছালাম ফিরছিলেন, মনিরাকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তাড়াতাড়ি মোনাজাত শেষ করে উঠে গিয়ে ধরলেন মনিরাকে— মনিরা কি হয়েছে?

মামীমা, ও এসেছে।

সে, আমার মনির?

হাঁ, মামীমা। চলো তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে সে।

মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো, মনিরাকে আঁকড়ে ধরে বললেন চল, মনিরা—চল, নইলে আবার পালিয়ে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে মরিয়ম বেগমের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর। হেসে বললো—না, আর পালিয়ে যাবোনা মা।

সত্যি, পরে সত্যি বলছিস?

হাঁ, মনিরার চক্ষু চিকিৎসার জন্য আমাকে থাকতে হবে এখানে।

বাবা মনির! আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠেন মরিয়ম বেগম। সন্তানকে সব সময়ের জন্য পাশে পাবেন— এ যেন তার পরম সৌভাগ্য।

বনহুরকে পেয়ে মরিয়ম বেগম যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কিন্তু তাঁকে সব সময় সংযত হয়ে থাকতে হলো। বাড়ীর সকলের নিকটে বলা হলো—মনির তার আত্মীয়ের ছেলে। দূর দেশে চাকরী করে—ছুটিতে কয়েক দিন থাকবে বলে এসেছে এখানে।

বাড়ীর চাকর-বাকর এবং অন্যান্য সবাই কেউ বনহুরকে দেখে নাই কোনদিন, সকলেই বিশ্বাস করলো কথাটা।

একমাত্র সরকার সাহেব ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে কেউ জানলো না কে এই যুবক- কি এর পরিচয়।

দিনের আলোতে এমন করে বনহুর কোন দিন এ বাড়ীতে আসেনি বা থাকেনি। মরিয়ম বেগম বা মনিরা দিনের আলোতে কোন দিন দেখেনি

পুত্রকে মরিয়ম বেগম প্রাণভরে দেখতে লাগলেন। শতবার দেখলেও যেন তৃপ্তি হচ্ছেনা।

বনহুর হেসে বললো— মা অমন করে কি দেখছো?

তোকে প্রাণভরে তোকে দেখছি বাছা।

মা। বনহুর মায়ের বুকে ছোট শিশুর মতই আশ্রয় নেয়।

মনিরা দাঁড়িয়েছিলো পাশে, মাতা-পুত্রের কথাগুলো তার হৃদয়ে মধু বর্ষণ করছিলো। যদিও দেখতে পাচ্ছিলোনা কিছু কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করছিলো সব।

মাতা-পুত্রের মিলন দৃশ্য মনিরার দৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও সমস্ত মনের পর্দায় পরিস্ফুটিত হচ্ছিলো। মনিরার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

বনহুর আজ স্বাভাবিক নাগরিকের বেশে সজ্জিত। মূল্যবান কোট-প্যান্ট-টাই পরিহিত অবস্থায় রয়েছে।

সকাল বেলার চা-নাস্তা খাবার পর বনহুর মাকে জানালো—মা, আমি মনিরাকে তার বান্ধবী ডক্টর জুলেখার ওখানে নিয়ে যেতে চাই?

আতঙ্কগ্রস্ত মনে বললেন মরিয়ম বেগম— কিন্তু হঠাৎ যদি কেউ তোকে চিনে ফেলে বাবা?

হাসলো বনহুর—ভয় পেওনা মা। এ শহরে আমাকে কয়েকজন বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার ছাড়া কেউ চেনেনা।

মরিয়ম বেগম পুত্রের কথায় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত না হলেও আর অমত করলেন না। তিনি বললেন— যাও বাবা। যাও— সাবধানে যেও।

বনহুর মনিরাকে নিয়ে গাড়ীতে চেপে বসলো।

ড্রাইভ করে চললো বনহুর নিজেই।

মনিরা ড্রাইভিং আসনে পাশে বসে রয়েছে, আজ তার মনে অফুরন্ত আনন্দ। স্বামীর পাশে সে বসে রয়েছে—এযে তার কত কামনার কত সাধনার, কত প্রতীক্ষার।

মনিরা অন্ধ হলেও জুলেখার বাড়ীর ঠিকানা তার জানা রয়েছে। বনহুর মনিরার কাছে জুলেখার বাড়ীর পথের নির্দেশ নিয়ে উপস্থিত হলো সেখানে।

জুলেখা সবেমাত্র মনিরার ওখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এই মুহূর্তে মনিরাও তার সঙ্গে একটি যুবককে দেখে বিস্মিত হলো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে এগিয়ে এলো জুলেখা—হ্যালো মনিরা, তুমি এসে গেছো?

জুলেখা মানিরাকে জড়িয়ে ধরলো, কিন্তু বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই একটু সংকুচিতভাবে সরে দাঁড়ালো।

মনিরা বললো—জুলেখা, তোর কাছে এলাম। হাঁ, আগে তোর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দি।

বনহুর মনিরার পিঠে হাত রেখে কিছু ইংগিত করলো।

মনিরা হেসে বললো—আমার দূর সম্পর্কে ভাই হন। সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে, আমাদের ওখানে থাকবে কয়েক দিন। আর এ হচ্ছে আমার প্রিয় বান্ধবী জুলেখা— ডক্টর এবং আইজস্পেশালিষ্ট।

বনহুর ও জুলেখা ছালাম বিনিময় করলো।

নিজের অলক্ষ্যে জুলেখার দৃষ্টি বার বার চলে যাচ্ছিলো বনহুরের মুখের দিকে। মনের মধ্যে একটা অদ্ভূত অনুভূতি নাড়া দিচ্ছিলো তার। বললো জুলেখা—উর নাম তো বললিনা মনিরা?

ওঃ ভুল হয়ে গেছে, প্রথম নাম বলাই উচিৎ ছিলো........

মনিরা বলার পূর্বেই বললে বনহুর— আমার নাম মঞ্জুর চৌধুরী। মঞ্জুর বলেই ডাকবেন, চলুন ভিতরে গিয়ে বসি।

সরি, এতোক্ষণ আপনাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছি। চলুন।

জুলেখা মনিরার হাত ধরে নিয়ে চললো। বনহুর এগুলো পিছনে পিছনে।

হলঘরে এসে বললো জুলেখা—বসুন আপনি। মনিরা, বস্ ভাই। আমি কিন্তু তোর ওখানেই যাচ্ছিলাম।

জুলেখা আর মনিরার মধ্যে উভয়ে উভয়কে কখনও 'তুমি' কখনও 'তুই' বলে সম্বোধন করতো।

জুলেখার কথায় বললো মনিরা— তাহলে ভালই হতো।

না, তোমরা এসেছো— খুব ভাল হয়েছে। আচ্ছা তোমরা একটু বসো— আমি তোমাদের জন্য চা আনতে বলি।

জুলেখা চলে গেলো।

বনহুর মনিরার হাতের উপরে হাত রেখে চাপা কণ্ঠে বললো—সতর্কভাবে কথা বলবে মনিরা তোমার বান্ধবী যেন বুঝতে না পারে তোমার আমার গোপন সম্বন্ধ।

আচ্ছা, তুমি যেভাবে বলবে, আমি তাই করবো।

ফিরে এলো জুলেখা, পিছনে বয়ের হাতে চায়ের সরঞ্জাম।

বনহুর আর মনিরার সম্মুখে চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে সরে দাঁড়ালো বয়।

জুলেখা পাশের একটা সোফায় বসে চা তৈরী করে বনহুর ও মনিরাকে সম্মুখে বাড়িয়ে দিলো।

প্রথম মনিরার হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে, পরের কাপটা এগিয়ে ধরলো বনহুরের দিকে—নিন।

বনহুর জুলেখার হাত থেকে কাপটা নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললো—ধন্যবাদ।

চা পান করতে করতে আলাপ শুরু হলো বনহুর, জুলেখা আর মনিরার মধ্যে।

মনিরার চক্ষু চিকিৎসা নিয়েই আলোচনা চললো।

জুলেখা বললো—আমি যেমন করে হোক আমার বান্ধবীর দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবো।

বনহুর আগ্রহ ভরা কণ্ঠে বললো— মিস্ জুলেখা, আপনার কি মনে হয় মনিরার দৃষ্টিশক্তি পুনঃ ফিরে আসবে?

আমার মনে হয় আসবে।

বনহুরের চোখ দুটো খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

জুলেখা শান্তভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো— আমি আজ ক'দিন থেকে মনিরাকে নিয়ে ভাবছি। একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি। মনে হয় ওর দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবো। কিন্তু......মনিরাকে আমার এখানে থাকতে হবে।

মনিরা বললো এবার— তোর এখানে?

হাঁ, কারণ তোর চোখের নার্ভ শিথিল হয়ে গেছে! আমাকে নানাভাবে চেষ্টা নিতে হবে—প্রতি এক ঘন্টা পর পর তোর চোখে ঔষধ লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে , কাজেই তোকে ছেড়ে দিলে চলবেনা। আমি এ জন্যই একটু আগে তোদের ওখানে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু...... কিছু বলতে গিয়ে থেমে পড়লো মনিরা।

জুলেখা বলে উঠলো—কোন কিন্তু নয় মনিরা, যতই হোক আমি তোকে ছেড়ে দেবোনা।

মনিরার আজ দেখবার ক্ষমতা নাই, তাহলে স্বামীর মুখভাব লক্ষ্য করে দেখতো। বললো আবার মনিরা—মামীমার কাছে কথাটা পেড়ে দেখবো তিনি কি বলেন।

মনিরার কথা শেষ না হতে বললো বনহুর উনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অমত করবেন না মনিরা, কারণ এখন তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আনার জন্য সব কিছুতেই রাজী হবেন।

মনিরা বনহুরের কথায় বুঝতে পারলো এ ব্যাপারে অমত নেই তার। জুলেখা বলে উঠলো— ঠিক বলছেন মঞ্জুর সাহেব, মনিরার চোখে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি আমার এখানে থাকতে অমত করতে পারেন না।

কথার ফাঁকে চা পান শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো।

জুলেখা বললো—মামীমাকে আমি গিয়ে সব বলে আসবো।

বনহুর এক মুখ ধোঁয়া ছুড়ে সোফায় ঠেস দিয়ে বসে বললো—তাহলে আমার ছুটি কেমন?

মনিরা কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার পূর্বেই বলে উঠলো জুলেখা—আমার বাড়ীতে জায়গার কোন সংকীর্ণতা নেই দেখছেন তো। এতো বড় বাড়ীটায় মাত্র আমরা তিনটি প্রাণী। আমার আম্মা, আমার বড় ভাই, আর আমি। আম্মা উপরেই থাকেন—নীচে নামেন না। বড় ভাই সব সময় তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অনেক রাতে ফেরেন। তিনিও উপরে থাকেন। আমিও উপরে শুই। আর এই যে নীচের কামরাগুলো সব ফাঁকা পড়ে থাকে, থাকবার লোক নেই। হলঘরের ওদিকেরটা আমার লেব্রটরী, পাশেরটা চ্যাম্বার। আসুন না আমার সঙ্গে দেখবেন— আয় মনিরা। জুলেখা উঠে দাঁড়িয়ে মনিরার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিলো।

মনিরা বললো— আমি তো আগেই দেখেছিলাম— আর এখন কি দেখতে পাবো?

তবুও চল্। মনিরার হাত ধরে জুলেখা অগ্রসর হলো।

বনহুর অনুসরণ করলো জুলেখাকে।

বাড়ীটা সেকেলের তৈরী হলেও আধুনিক ছাঁচে তৈরী। বনহুর এ বাড়ীতে আসেনি কোনদিন, ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো। নীচের কক্ষগুলিতে কেউ বাস না করলেও প্রত্যেকটা কক্ষ মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত।

জুলেখা নিজ লেব্রটরী আর চ্যাম্বারও দেখালো। চ্যাম্বারের পাশের কামরায় প্রবেশ করে বললো জুলেখা— মনিরা, তুমি এ কক্ষেই থাকবে, একা নয়— আমিও থাকবো তোমার পাশের বেডে।

বনহুর হেসে বললো— তাহলে তো কোন অসুবিধা নেই। আপনি যখন ওর সমস্ত দায়ীত্বভার গ্রহণ করছেন।

কিন্তু আপনার যদি কোন অসুবিধা না থাকে তবে আমাকে মনিরার ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন। কারণ আমি যখন আমার অন্যান্য পেসেন্টদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবো। তখন মনিরার পাশে থাকবার কেউ থাকবেনা। আসুন মঞ্জুর সাহেব, আপনার কক্ষ দেখিয়ে দি।

বনহুরকে অগত্যা জুলেখার কথায় রাজি হতে হলো।

মনিরার পাশের কক্ষেই বনহুরের থাকার জন্য সাব্যস্ত হলো।

জুলেখা সমস্ত কথা পাকাপাকি করে নিয়ে মনিরা ও বনহুরসহ চৌধুরী বাড়ীতে গেলো এবং মরিয়ম বেগমকে সব কথা বুঝিয়ে বললো সে।

মরিয়ম বেগম আপত্তি করতে পারলেননা।

জুলেখা মনিরার মঙ্গলের জন্যই চিন্তা করছে, কাজেই এতে তার আপত্তি কি আছে বরং তিনি খুশীই হলেন।

মনিরা আর জুলেখা পাশের কক্ষে শুয়ে আছে পাশাপাশি বেডে। রাত বেশী না হলেও বাড়ীটা নিশুতি হয়ে পড়েছিলো। জুলেখার আম্মা বাতের ব্যথায় ভোগা মানুষ, তিনি সন্ধ্যার পর চারটি খেয়ে নিয়ে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বিশ্বাসী ঝি আর চাকরগুলো বাড়ীটা চালিয়ে নেয় কোন রকমে। তাছাড়া উপাই বা কি আছে। ব্যাপারটা নতুন নয়, কাজেই গা সওয়া হয়ে গেছে সকলের।

নাসির শাহ বাড়ী ফেরে গভীর রাতে; কোন দিন রাত দুটো তিনটা বেজে যায়। টেবিলে তার খাবার ঢাকা থাকে, নাসির শাহ এলে তাদের পুরোন চাকর হবু এসে খাবার আগলা করে দেয়, দাঁড়িয়ে থাকে পাশে।

হবু এ বাড়ীতে এসেছে আজ প্রায় বিশ বছর হলো। যুবক এসেছিলো— বুড়ো হয়েছে। নাসির শাহই নয়—এ বাড়ীতে সবাই তার হাতে মানুষ হয়েছে। নাসির শাহর জন্য শুধু একদিন নয়, দুদিন নয়—যখন থেকে নাসির শাহ যুবক হয়েছে, তখন থেকে হবুকে এমনি রাতের পর রাত জেগে কাটাতে হয়েছে। একদিন যদি হবুর ঘুম ভাংতে বিলম্ব হয় বা কোনরকম অসুবিধায় আসতে না পারে তাহলে নাসির শাহ থালা বাসন ভেংগে একাকার করে ফেলে। আর যদি কোন দিন মাতাল অবস্থা বাড়ী ফেরে সেদিন খাবার টেবিলে না বসে সোজা বিছানায় গিয়ে ঢলে পড়ে। জুতো খুলবার সময় হয়না।

হবু ওর জুতো খুলে দেয়। মাথাটা তুলে বালিসে রাখে, চাদরটা টেনে দেয় গায়ে।

কাজেই নাসির শাহর আগমন কোন দিন সন্ধ্যা-রাতে হয়না।

বাড়ীর চাকর-বাকর সবাই খেয়ে-দেয়ে নাক ডাকাচ্ছে। হবু অবশ্য জেগে আছে,. তবু বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো নাসিরের প্রতীক্ষায়।

জুলেখা আর মনিরা পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে গল্প করছিলো। পাশের কক্ষে বনহুর একটা সোফায় বসে বই পড়ছে। দক্ষিণ হস্তে বইখানা ধরা

রয়েছে তার চোখের সম্মুখে। বাম হস্তের আংগুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট। বনহুরের দৃষ্টি বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ। অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইখানা পড়ছিলো সে। কোন অনুবাদ কাহিনী হবে।

হঠাৎ হাসির শব্দে বনহুরের মনোযোগ সহকারে বই পড়ার ব্যাঘাত ঘটলো। দৃষ্টি বইএর পাতায় সীমাবদ্ধ থাকলেও কান সজাগ হলো এবার!

পাশের কক্ষ থেকে ভেসে আসছে, জুলেখা আর মনিরার হাসির শব্দ, খিল খিল করে হাসছে ওরা দুজনা। হাসি থেমে গেলো, শুনতে পেলো বনহুর এবার জুলেখার কণ্ঠ—সত্যি করে বলছিস ওর সঙ্গে তোর কোন.....

মনিরার কণ্ঠ—বললাম তো ওর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া আমার কি অতো বড় ভাগ্য হবে?

জুলেখার গলার আওয়াজ শোনা গেল এবার—উনি কিন্তু তোকে বড্ড ভালবাসেন।

মনিরা বললো—ভালবাসা নয় জুলেখা—অনুগ্রহ করেন।

কিন্তু আমার যেন মনে হয়, তোর দিকে মঞ্জুর সাহেবের গভীর একটা আকর্ষণ আছে।

কেমন করে তোর মনে হলো?

না হলে সে সব ছেড়ে তোর জন্য এখানে রয়ে গেলো। সত্যি মনিরা, উনাকে আমার বড্ড ভাল লাগে।

সত্যি নাকি?

সত্যি।

বলবো নাকি কিছু?

খবরদার, তাহলে তোর চুল ছিড়ে দেবো কিন্তু......

মনিরার কণ্ঠ—উঃ ছেড়ে দাও সত্যি বলবোনা। আঃ বড্ড জোরে ধরেছিস কিন্তু আমার চুলগুলো।

আচ্ছা ছেড়ে দিলাম কিন্তু ওকে যেন কোন কথা বলিসনে।

না না, আমি কি অবুঝ খুকী।

জুলেখা, আপন মনে বললো এবার—অদ্ভুত মানুষ!

কে?

মঞ্জুর সাহেব।

কি করে বুঝলি সে অদ্ভুত?

তার চাল-চলনে। আজ ক'দিন তুই আমার এখানে এসেছিল। উনিও এসেছেন—এতো সুন্দর মধুর স্বভাব আমি কোন পুরুষের মধ্যে দেখতে পাইনি।

বনহুর পাশের কক্ষে সোফায় বসে সব শুনছিলো, বই রেখে উঠে দাঁড়ালো সে।

কিছুক্ষণ পায়চারী করলো সে নিজের কক্ষে, তারপর শয্যায় এসে বসলো।

আজ ক'দিন থেকে মনিরার চক্ষু চিকিৎসা চলেছে। এক ঘন্টা পর পর মনিরার চোখে ঔষধ লাগাতে হয়। মাঝে মাঝে ইনজেকশানও দেয় জুলেখা মনিরার বাহুতে।

পাশের চ্যাম্বারে অন্যান্য পেসেন্টদের ভীড়েও জুলেখা ভুলে যায়না তার কর্তব্য। জুলেখা নিয়মিতভাবে মনিরার চিকিৎসা করে চলে।

সেদিন মনিরাকে তার চ্যাম্বারে বসিয়ে চোখ পরীক্ষা করে দেখছিলো জুলেখা। আগের চেয়ে এখন অনেকটা সতেজ মনে হচ্ছে মনিরার চক্ষুসংশ্লিষ্ট নার্ভগুলি।

জুলেখা খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠলো, ভুলে গেলো সে এটা তার চ্যাম্বার। শুধু মনিরাই নয় এখানে আরও অনেক রোগী রয়েছে, জুলেখা জড়িয়ে ধরলো মনিরাকে—মনিরা আমার সাধনা সার্থক হবে। মনিরা আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে......

ঠিক সেই মুহূর্তে চ্যাম্বারে প্রবেশ করে বনহুর। মনিরাকে জুলেখা বাহুর মধ্যে তখনও আকড়ে ধরে রেখেছে, চোখে-মুখে খুশীর উৎস ফুটে উঠেছে তার।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো জুলেখা আর মনিরার দিকে।

জুলেখা উচ্ছাসিত কণ্ঠে বললো—মঞ্জুর সাহেব,. আমি মনিরার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হব বলে আশা করছি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর।

মনিরার চোখে আজ একটা ছোট্ট অপারেশন হবে। অপারেশন টেবিলে মনিরা শায়িত। জুলেখা নিজে অপারেশন করবে। তাকে সহায়তা করছে তার মহিলা সহকারিণী। পাশে দাঁড়িয়ে মঞ্জুর চৌধুরী বেশে দস্যু বনহুর।

জুলেখা অত্যন্ত যত্ন সহকারে কাজ করছিলো।

বনহুরও জুলেখাকে সাধ্যমত সাহায্য করছিলো, জুলেখার পাশে থেকে।

অপারেশন শেষ হয়ে যায়, চ্যাম্বারে নতুন একটা পেসেন্টকে ঔষধ দেবার জন্য বেরিয়ে যায় জুলেখার সহকারিণী।

মনিরার চোখে তখন ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছিলো জুলেখা। বনহুর তাকে সাহায্য করতে লাগলো।

ব্যান্ডেজ শেষ করে যখন পিন-আপ করছিলো জুলেখা, বনহুরের হাতখানা তার হাত স্পর্শ করে। জুলেখার সমস্ত শরীরে একটা অনুভূতি নাড়া দিয়ে যায়। শিরায় শিরায় জাগে একটা শিহরণ।

জুলেখা মনিরার চোখের ব্যান্ডেজ পিন-আপ্ শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

বনহুর তখন মনিরার কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিচ্ছিলো। ফিরে তাকাতেই বনহুরের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো জুলেখার!

জুলেখার চোখে—মুখে একটা আবেগভরা ভাব ফুটে উঠেছে। বনহুর চট্ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না।

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে বললো—বড্ড পিপাসা।

জুলেখার সম্বিৎ ফিরে আসে তাড়াতাড়ি পাশের টেবিল থেকে পানির গেলাসটা তুলে নিয়ে মনিরার মুখে ঢেলে দেয়।

মনিরা জুলেখার দক্ষিণ হাত্খানা মুঠায় চেপে ধরে—জুলেখা।

জুলেখা চট্ করে জবাব দিতে পারছিলো না, একটু কেশে গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে বললো—কোন কষ্ট হচ্ছে?

না, কিন্তু কেমন ভয় হচ্ছে আমার।

জুলেখার দৃষ্টি নিজের অজ্ঞাতে আর একবার চলে গেলো বনহুরের মুখে।

বনহুর তখনও তাকিয়ে আছে জুলেখার দিকে।

আবার উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

মনিরা বললো—আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে চলো।

জুলেখা বললো—চলো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

অপারেশনের পর মনিরার চোখ দু'টো তুলো আর ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একেই সে দুনিয়ার কিছু দেখতে পায় না, তারপর আরও যেন সব গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সব কেমন জমাট অন্ধকারে ভরা, পৃথিবীর কোথাও যেন এতোটুকু আলো নেই।

নিজের বিছানায় শুয়ে ছট্ফট্ করছিলো মনিরা, স্বামীকে পাশে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো সে। মাথায়-চুলে হাতখানা বুলিয়ে একটু সান্ত্বনা ভরা কথা বলবে। কিন্তু এতো কাছে থেকেও কত দূরে,—অসহ্য লাগছিলো মনিরার।

বনহুরও পাশের কামরায় মনিরার সান্নিধ্য লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো, কিছুতেই নিজকে স্থির রাখতে পারছিলো না। মনিরার জন্য নানা রকম দুঃশ্চিন্তার ঝড় বইছিলো তার মনের মধ্যে। সত্যি কি মনিরা আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। সত্যি কি মনিরা আবার তাকে দেখতে পাবে। দেখতে পাবে সমস্ত পৃথিবীটাকে।

বনহুর নিজের কক্ষে পায়চারী করছিলো। রাত তখন অনেক হয়ে গেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছে মনিরা।

কিন্তু এখনও পাশের বিছানায় জেগে আছে জুলেখা। অনেক চেষ্টা করেও চোখের পাতা দুটো বন্ধ করতে পারছে না। মনের মধ্যে একটা আলোড়ন তাকে করে তুলেছে উন্মত্ত। কয়েক দিন পূর্বেও মনিরার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার চিন্তা তাকে অহরহঃ অস্থির করে তুলেছিলো। তার সাধনা, তার প্রচেষ্টা সফল করে তোলার জন্য হয়ে উঠেছিলো উন্মাদ। রাতের পর রাত চক্ষু চিকিৎসা সম্বন্ধে বইগুলি খুলে গভীর মনোযোগ সহকারে ঘাটাঘাটি করেছে। কেমন করে বান্ধবীকে সে আরোগ্য করবে, কেমন করে ফিরিয়ে আনবে তার চোখের আলো। বান্ধবীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে না পারলে তার বিদেশে শিক্ষা লাভ সব পন্ড হয়ে যাবে। তার সাধনা সংগ্রাম সব ব্যর্থতায় পূর্ণ হবে। বান্ধবীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা তার চাই......

কিন্তু আজ জুলেখার চিন্তার মোড় ফিরে গেছে অন্যদিকে। তার মনে এখন দন্দ্ব চলেছে। মনিরার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলেই হারাবে সে মঞ্জুর সাহেবকে। মঞ্জুর চৌধুরীকে সে নিজের অজ্ঞাতে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু সে যে ডাক্তার.....ডাক্তারের কর্তব্য রোগীকে আরোগ্য করে তোলা, রোগীকে রোগমুক্ত করা—কিন্তু মনিরার দৃষ্টি ফিরে এলে কি করে তা সম্ভব হবে যা সে চায়। জুলেখা চায় মঞ্জুর চৌধুরীকে নিজের করে পেতে।

জুলেখা কিছুতেই মনকে সুস্থির করতে পারছেনা। একদিকে বান্ধবীর চক্ষুদান অন্যদিকে মঞ্জুর চৌধুরীকে হারানোর ভয়। সত্যিই যদি মনিরার দৃষ্টিশক্তি আর কোন দিন ফিরে না আসে, তাহলে—তাহলেই মঞ্জুর চৌধুরী সরে পড়বে তার পাশ থেকে। অন্ধ নারীকে কোন পুরুষ কোনদিন জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে পারে না। হাঁ, জুলেখা তাই করবে! জুলেখা তাই করবে, ভুলে যাবে সে কর্তব্য।

❑

পরদিন।

লেবরেটরী কক্ষে টেবিলে মাথা রেখে বসে আছে জুলেখা।

হঠাৎ জুলেখাকে খুঁজতে গিয়ে লেবরেটরী কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর—এই যে মিস জুলেখা, আপনি এখানে.....

বনহুরের কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে তাকালো জুলেখা, কোন জবাব দিলো না।

বনহুর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, জুলেখার মুখে-চোখে নজর পড়তেই চমকে উঠলো সে, বললো—মিস্ জুলেখা, আপনি কি অসুস্থ?

না।

কিন্তু আপনার চোখ-মুখ স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না।

বনহুরের কথায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে সংযত করে নেবার চেষ্টা করলো জুলেখা।

বনহুর বললো—মিস্ জুলেখা, মনিরা আপনাকে ডাকছে।

উঠে দাঁড়ায় জুলেখা, বলে—চলুন।

বনহুর আর জুলেখা মনিরার কক্ষে প্রবেশ করলো।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো মনিরা—কে, জুলেখা?

জুলেখা মনিরার পাশে এসে পিঠে হাত রাখলো।

বনহুর বললো—মনিরা, তুমি না তোমার বান্ধবীকে খুঁজেছিলে? বলো কি বলতে চাও তাকে।

জুলেখাই বললো এবার—কেমন লাগছে মনিরা?

ভাল না। আজ বড় অন্ধকার লাগছে সব।

জুলেখা কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—এখানে তোর মন টিকছেনা তাই মন অস্থির লাগছে।

হাঁ জুলেখা, আমার মনে হচ্ছে কোথাও দূরে চলে যাই; কোন দূর দেশে....

মনিরা! অস্ফুট কণ্ঠে বললো জুলেখা।

বনহুর বললো এবার—মিস জুলেখা, আমার মনে হয় মনিরাকে কোন সমুদ্রতীরে মুক্ত জায়গায় নিয়ে গেলে ভাল হতো।

মনিরা যদি এমন কোন ইচ্ছা করে থাকে তবে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এক সপ্তাহ পর মনিরার চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে নতুনভাবে ঔষধ লাগাতে হবে।

মিস্ জুলেখা, আপনাকেও তাহলে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।
আমাকে!
হাঁ। বললো বনহুর।
জুলেখা অন্যদিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো—সম্ভব নয়।
মনিরা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—কেনো জুলেখা? কেনো সম্ভব নয়?
আমার রোগী, আমার লেবরেটরী ছেড়ে যাবো কি করে বল?
মনিরা অভিমান ভরা কণ্ঠে বললো—তাহলে আমাকে মেরে ফেল্। আমাকে মেরে ফেল্ জুলেখা.....
মনিরা। জুলেখা মনিরার মাথায় হাত রাখলো।
মনিরা বললো আবার—তুই না গেলে আমি কোথাও যাবোনা—যাবোনা আমি।
বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো— মিস্ জুলেখা, মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য চলুন। ফিরে এসে ওর চোখের বাঁধন মুক্ত করে দেবেন।
শেষ পর্যন্ত মনিরাকে হরিদ্রা সাগর সৈকতের ধারে নিয়ে যাওয়াই মনস্থ হলো, কান্দাই শহর ছেড়ে উত্তর দেশ হরিদ্রা। নির্জন সাগর তীরে ছোট্ট একটি বাংলো।
বনহুর মনিরা সহ এই বাংলোয় এসে উঠলো। জুলেখাকেও ধরে এনেছে তারা সঙ্গে করে।
জুলেখা মনিরার জেদ এড়াতে পারেনি, তাছাড়াও বনহুরের অনুরোধেও তাকে আসতে হলো তাদের সঙ্গে।
জুলেখা কয়েক দিনের জন্য তার পেসেন্টদের দায়িত্বভার সহপাঠি মিঃ হামিদের হাতে সঁপে দিয়ে এলো। মিঃ হামিদকে সহায়তা করবে তার অভিজ্ঞ সহকারিণী মিস রীণা রায়।
কাজেই এ ব্যাপারে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে জুলেখা।
সাগর তীরের উচ্চ একটা টিলার উপরে সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি বাংলো
পাশাপাশি দুটো কামরায় ওরা উঠলো।
একটি বনহুর দ্বিতীয়টিতে জুলেখা আর মনিরা। বাংলোর সম্মুখে কিছুটা দূরে সমুদ্র। চারিদিকে শুধু জল আর জল, প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলি উচ্ছলভাবে ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে, বাংলোর পাদমূলে পাথরগুলির উপরে।
বাংলোর অদূরে কতকগুলি ভীল পল্লী। এছাড়া কোন সভ্য লোকের বসোবাস নেই এ অঞ্চলে।
বাংলোটা বেশ নীরব নির্জন সব সময়ের জন্য।
বনহুরের কাছে খুব ভাল লাগলো জায়গাটা।

জুলেখা সব সময় মনিরার পাশে পাশে থাকে, যখন মনে করে হাত ধরে নিয়ে যায় সমুদ্রতীরে। ঘুরে বেড়ায় ওরা। বনহুরও সঙ্গে থাকে ওদের

সমুদ্র সৈকতের অপরূপ সৌন্দর্য লক্ষ করে মুগ্ধ হয় বনহুর আর জুলেখা! মনিরার দৃষ্টিশক্তি নেই, তবু আবহাওয়াটা তার মনে একটা অনাবিল আনন্দ এনে দেয়।

বলে মনিরা—কি সুন্দর হাওয়া, তাই না জুলেখা?

হ্যাঁ। ছোট জবাব দেয় জুলেখা।

বনহুর বলে উঠে— চলো মনিরা, সাগরের তীরে গিয়ে দাঁড়াই। আসুন মিস জুলেখা, ওকে আমরা সাগরতীরে নিয়ে যাই।

চলুন।

জুলেখা মনিরার হাত ধরে, কিন্তু উঁচুনীচু টিলা বেয়ে নীচে নামতে মনিরার খুব অসুবিধা হচ্ছিলো।

বনহুর মনিরার আর একটি হাত ধরে বললো— চলো।

সমুদ্র সৈকতে আসার পর দু'দিন কেটে গেছে, এ দু'দিনের মধ্যে স্বামীর স্পর্শ মনিরা একবারও পায়নি। স্বামীর হাতে হাত রেখে মনিরা স্বর্গের শান্তি হৃদয়ে অনুভব করে।

বনহুর মনিরাকে নিয়ে অতি সাবধানে এগুচ্ছিলো।

জুলেখাও সাহায্য করছিলো মনিরাকে।

সাগরতীরে এসে দাঁড়ালো ওরা তিন জন।

যে স্থানে এসে দাঁড়ালো সে স্থানে শুধু সোনালী বালুকা রাশি ভোরের সূর্যের আলোতে চিক্‌মিক্ করছে।

মনিরা, জুলেখা আর বনহুর দাঁড়াতেই ছোট ছোট ঢেউগুলি আছড়ে এসে পড়লো তাদের পায়ের উপরে।

মনিরা দেখতে না পেলেও খুশীতে আত্মহারা হলো। ছুটো-ছুটি করে বেড়াতে ইচ্ছা হলো, জুলেখা আর বনহুরের পাশ থেকে আপন মনে সরে গেলো। হাঁটু গেড়ে বসে ঢেউগুলি ধরবার জন্য হাত বাড়ালো।

জুলেখা বললো—জামা-কাপড় ভিজে গেলো মনিরা।

যেতে দাও জুলেখা, সব ভিজে যেতে দাও। ইস কি আনন্দ, কি আনন্দ! সত্যি, খুব আনন্দ লাগছে, না?

বনহুর আর জুলেখা ব্যথাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মনিরার মুখে।

মনিরার প্রাণভরে ঢেউগুলিকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে সে।

বনহুর মনিরার আনন্দে তৃপ্তি লাভ করে। মনিরার দিকে তাকিয়ে হাসে বনহুর।

হঠাৎ ফিরে তাকায় বনহুর জুলেখার মুখে, জুলেখা নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

জুলেখার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই, জুলেখা দৃষ্টি নত করে নেয়।

এক সময় ওরা তিন জনা ফিরে আসে বাংলোয়।

বাংলোর বারেন্দায় পাশাপাশি তিনখানা সোফায় বসে পড়ে ওরা তিন জনা।

সমুদ্রের মুক্ত হাওয়া আর মিষ্টি মিষ্টি রৌদ্র ওদের মনে।

নতুন সুর জাগায়।

বনহুর বয়কে আদেশ দেয় চা আনতে।

চা পান করতে করতে অনেক কথা চলে ওদের মধ্যে।

হাসি-গল্প নিয়ে মেতে উঠে ওরা, বিশেষ করে মনিরাকে আনন্দ দেবার জন্য বনহুর অনেক হাসির গল্প বলে। মনিরার মুখে হাসি ফুটাবার আপ্রাণ চেষ্টা বনহুরের।

বনহুর যখন অন্যমনস্কভাবে কথা বলে চলে, জুলেখা তখন চিত্রার্পিতের মত তাকিয়ে থাকে বনহুরের হাস্য-উজ্জল সুন্দর মুখমন্ডলের দিকে। যতই দেখে ততই যেন আর দেখবার বাসনা উন্মুখ করে তোলে, মনের গোপন ইচ্ছা কিছুতেই গোপন রাখতে পারে না জুলেখা। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠছে। একটা অগভীর আকর্ষণ নিয়ে হৃদয়ে উপলব্ধি করছে সে।

জুলেখা জানে, মঞ্জুর সাহেব মনিরাকে ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে তাকে বিয়ে করাই হয়তো তার বাসনা ছিলো? তাই মঞ্জুর সাহেব চায় মনিরাকে আরগ্য করে তুলতে। তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনতে। জুলেখা বেশ বুঝতে পেরেছে, মঞ্জুর সাহেব আর মনিরার মধ্যে গভীর একটা সম্বন্ধ লুকানো আছে। কিন্তু জুলেখা এখন জানেনা—কি তাদের সম্বন্ধ। জানলে হয়তো নিজকে এতোখানি ছেড়ে দিতে পারতো না সে মঞ্জুর সাহেবের দিকে। এটুকুই জানে জুলেখা—ওদের মধ্যে একটা গভীর প্রেম বা প্রীতি রয়েছে, কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না যতক্ষণ না মনিরা দৃষ্টিলাভে সক্ষম হয়। আপন মনে হাসে জুলেখা, মনিরার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা এখন তার আয়ত্বের মধ্যে।

বনহুর বললো—মিস্ জুলেখা, কি ভাবছেন?

না, কিছু না। চলো মনিরা ভিতরে যাই। জুলেখা মনিরা সহ বাংলার কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর একাই বসে রইলো সেখানে, ভাবতে লাগলো জুলেখার এই অন্যমনষ্কতার কথা। জুলেখার মনোভাব আজকাল স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। সব সময় সে বেশ ভাবাপন্ন এবং অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। বনহুর বুদ্ধিহীন

নয় সে বুঝতে পারে জুলেখার অন্তরের কথা। একটা ক্ষীণ হাসির রেখা তার ঠোটের কোণে ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়।

❑

জ্যোছনা প্লাবিত রাত।

অদূরস্থ ভীল পল্লী থেকে ভেসে আসছে মাদলের আওয়াজ। সাওতালদের কোন উৎসব আছে হয়তো আজ।

বনহুর নিজ কামরায় শুয়ে গভীরভাবে জুলেখার সম্বন্ধেই চিন্তা করছিল। জুলেখা ছাড়া মনিরার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কাজেই জুলেখার মনে কোন রকম অসন্তুষ্টির সৃষ্টি না হয় সেদিকে তাকে সতর্ক থাকতে হবে।

বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো, বয়ের কণ্ঠস্বর—স্যার, ও ঘরে ডাকছেন।

বনহুর মুখ তুলে তাকালো— কোন্ ঘরে?

স্যার, ও ঘরে।

যা, আসছি। বনহুর উঠে পড়লো। বেশী রাত হয়নি তো কাজেই এখনও তারা রাতের খাবার খায়নি। বনহুর মনে করলো বোধ হয় খাবার জন্য ডাক পড়েছে।

মনিরা আর জুলেখা যে কক্ষে থাকতো সেই কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর।

মনিরা বললো—এসেছো?

হাঁ, কেনো?

শুনতে পাচ্ছো কিছু?

পাচ্ছি।

কি?

সাওতালদের কোন উৎসব হচ্ছে।

ইস্ কি সুন্দর মাদলের বাজনা।

যাবে ওখানে?

আমি কি যেতে পারবো? শোন, জুলেখাকে নিয়ে যাওনা একটু , কোন দিন ও সাঁওতালদের উৎসব দেখেনি।

বনহুর তাকালো জুলেখার দিকে।

জুলেখা বসে বসে কি যেন একটা কাঁটা দিয়ে বুনছিলো।

বললো সে—থাক, উনার অসুবিধা হবে।

বনহুর বললো— না, না আপনি যদি যেতে চান তাহলে আমার কোন অসুবিধা বা আপত্তি নেই, কিন্তু মনিরা, তুমি একা একা......

হেসে বললো মনিরা— বাংলোর দারওয়ান আছে, বয় আছে তাছাড়া আমার বীণা আছে ------ জুলেখা আমার বাণীটা দিয়ে যাও আমার কাছে।

জুলেখা হাতের কাঁটা এবং উল-সূতার গুটিটা ওপাশে রেখে উঠে দাঁড়ালো—চল্ আমি তোকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাবো।

মাফ কর জুলেখা, যা উঁচু-নীচু জায়গা..........

জুলেখা বীণা খানা এগিয়ে দেয় মনিরার হাতে।

মনিরা আসবার সময় বীণাখানা ছেড়ে আসেনি। নির্জন সাগর সৈকতে এটাও তার একজন সঙ্গী।

মনিরা বললো—বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, ওভারকোট পরে নিও তোমরা।

জুলেখা ওভারকোট পরে নিলো।

বনহুর পাশের কক্ষ থেকে ওভারকোটটা গায়ে পরতে পরতে এসে দাঁড়ালো, মনিরাকে উদ্দেশ্য করে বললো—এক্ষুণি ফিরে আসবো মনিরা, বাইরে দারওয়ানকে বলে যাচ্ছি।

জুলেখা আর বনহুর বেরিয়ে যায়।

মনিরা বীণা খানা টেনে নেয় কোলের উপর।

বাংলোর বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা দু'জনা— জুলেখা আর বনহুর। আজ পূর্ণিমা রাত্রি, আকাশে কোন মেঘের বালাই নেই। জ্যোছনা স্নাত পৃথিবী, কোথাও এতোটুকু যেন অন্ধকার নেই, নেই কোন মলিনতা।

উঁচুনীচু টিলার উপর দিয়ে পাশপাশি এগুচ্ছিলো বনহুর আর জুলেখা। বাংলোর কিছু দূরে ভীলপল্লী, মাদলের শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ভীলবালাদের কণ্ঠের অদ্ভুত গীত।

বাংলোর আশে পাশে খানিকটা জায়গা সমতল হলেও কিছুটা চলার পর শুধু টিলা আর টিলা ছোট ছোট খাদও আছে।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো তারা। জায়গাটা বেশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে।

বনহুর বুঝতে পারলো—জুলেখার এবার নামতে কষ্ট হবে, হঠাৎ নীচে পড়ে গেলে আহত হবার আশঙ্কা রয়েছে। অবশ্য বনহুরের কাছে এসব উঁচু— নীচু বা ঢালু কিছুই নয়। জুলেখাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বললো বনহুর —আমার হাত ধরুন।

জুলেখা জ্যোছনার আলোতে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। সম্মুখে বনহুরের হাতখানা বাড়ানো রয়েছে।

জুলেখা হাত রাখলো বনহুরের হাতে।

বনহুর বললো আসুন এবার কোন ভয় নেই।

জুলেখার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে, একটা অনুভূতি তার সমস্ত শিরায় শিরায় শিহরণ জাগালো। এমনি করে সে যদি যুগ যুগ ধরে পথ চলতে পারতো ওর হাতের মধ্যে হাত রেখে।

বনহুর বললো—কষ্ট হচ্ছে না তো?

উঁহুঁ কোন কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু আপনাকে আমি বড্ড কষ্ট দিলাম।

হাসলো বনহুর—কি যেন বলেন, এটা আবার কষ্ট নাকি?

সত্যি মঞ্জুর সাহেব, আপনি আশ্চর্য মানুষ। বললো জুলেখা।

বনহুর বললো—কোন ব্যতিক্রম দেখছেন বুঝি আমার মধ্যে?

তা দেখেছি বই কি?

কি রকম?

সে কথা আজ বলবো না। কথার ফাঁকে তারা প্রায় এসে যায় ভীল পল্লীর নিকটে।

ভীল পল্লীর সর্দার রতন বনহুরকে জানতো কারণ তার একজন সঙ্গী বাংলোর বাগানের মালীর কাজ করে।

বনহুর জুলেখা আর মনিরা বাংলোয় এসে উঠলেই সর্দার নিজে গিয়ে দেখা করে এসেছিলো, আজকের উৎসবে আমন্ত্রণও জানিয়ে এসেছিলেন সর্দার নিজে।

বনহুর আর জুলেখাকে দেখে খুশীতে আত্মহারা হলো রতন সর্দার।

তাদের ভাল করে একটা উঁচু জায়গায় বসিয়ে ফলমূল এনে দিলো খেতে। কচি ডাব এনে দিলো পানির পরিবর্তে।

বনহুর আর জুলেখাকে খেতে দিয়ে তাদের চারপাশে নাচ শুরু হলো। মশাল নাচ, জংলী —নাচ, ধিংকি—নাচ আরও কতরকম নাচ দেখালো ভীল পুরুষ আর নারীগণ বনহুর আর জুলেখাকে।

জুলেখা কোনদিন এসব নাচ দেখেনি, চিরদিন শহরে মানুষ সে। জংলী বা ভীলদের সংস্পর্শে আসেনি কোনদিন। অবাক হয়ে এ সব দেখতে লাগলো জুলেখা।

মাঝে মাঝে বনহুরের মুখে তাকিয়ে হাসছিলো সে।

মশালের আলোতে জ্যোছনার আলো স্তিমিত হয়ে গিয়েছিলো সেখানে।

বনহুর নাচ দেখলেও মন তার চঞ্চল হয়ে পড়ছিলো বারবার না জানি মনিরা কি করে? তাকে বলে এসেছে তাড়াতাড়ি ফিরবে। কিন্তু রাত যে অনেক হয়ে চললো।

বনহুর হাতঘড়ির দিকে তাকালো—ইস রাত দশটা বেজে গেছে।

জুলেখা উঠে দাঁড়ালো—চলুন।

আবার সেই পথ।

জ্যোছনার আলোতে ঝলমল করছে পাথুরিয়া পথঘাটগুলো।

জুলেখার মুখে আজ আনন্দের উচ্ছ্বাস।

হেসে বললো জুলেখা—আজকের কথা চিরদিন স্মরণ থাকবে মঞ্জুর সাহেব।

বনহুর ছোট্ট একটু জবাব দিলো —হুঁ।

জুলেখা আবার বললো—অপূর্ব এ দৃশ্য; অপূর্ব এ রাত।

আবার সেই ঢালু পথ। বনহুরের হাতে হাত রেখে জুলেখা এগুতে লাগলো।

এবার জুলেখা ইচ্ছা করেই বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠভাবে চলছিলো যেন কতদিনের পরিচয় ওদের দু'জনার মধ্যে।

বাংলোর নিকটবর্তী হতেই জুলেখা আর বনহুরের কানে ভেসে এলো বীণার সুরের অপূর্ব ঝঙ্কার।

বনহুর বললো—মনিরা এখনও জেগে আছে।

জুলেখা বললো—এতো রাত ঘুমায়নি—আশ্চর্য।

একা একা বেচারী---

বনহুরের কথায় জুলেখা কোন জবাব দেয়না।

❑

বাংলোয় ফিরে সেদিন আর কোন কথা হয়না কারো মধ্যে। বনহুর নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। সাঁওতাল পল্লী থেকে যে ফলমূল আর পানীয় পান করে এসেছিলো। তাতে খাবার আর প্রয়োজন হলো না তাদের।

জুলেখাও শয্যা গ্রহণ করলো ।

মনিরা বললো—ভীলদের নাচ কেমন লাগলো বললিনা তো জুলেখা?

জুলেখা চাদর মুড়ি দিতে দিতে বললো—অপূর্ব।

আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতো , সত্যি কি আনন্দ করে ঘুরে বেড়াতাম। তোরা কত সুখী জুলেখা, আর আমি---

মনিরা যখন নিজের দৃষ্টিশক্তির জন্য দুঃখ করছিলো তখন জুলেখার মনে অন্য চিন্তার রেশ ঝঙ্কার তুলছিলো। মনের গহনে উপলব্ধি করছিলো কিছু পূর্বে মঞ্জুর সাহেবের সঙ্গে তার মধুময় মুহূর্তগুলি। জুলেখার অন্তরে অন্তরে এক অপূর্ব শিহরণ জাগছিলো।

মনিরা ঘুমিয়ে পড়ে।

জুলেখার চোখে ঘুম নেই।

এপাশ ওপাশ করছে জুলেখা।

পাশের ঘরে বনহুরের চোখেও ঘুম নেই। কিন্তু তার মনে জুলেখার চিন্তা নয়, মনিরার সান্নিধ্য লাভ তাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। মুক্ত জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশি। জ্যোছনার আলোতে ফেনিল জলরাশি ঝলমল করছে যেন একসঙ্গে অনেকগুলো তারার মালা দোল খেয়ে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে।

বনহুর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

অদূরস্থ ভীল পল্লীর উৎসব থেমে গেছে, মাদলের শব্দ আর এখন শোনা যাচ্ছেনা। ছবির মত ঝাপসা লাগছে দূরে থেকে পল্লীর ছোট ছোট কুঠিরগুলো।

বনহুর বাংলো ছেড়ে এগিয়ে চলে সমুদ্রের দিকে।

একটা পাথরখন্ডে বসে পড়ে বনহুর। সম্মুখে সমুদ্র। ছোট ছোট ঢেউগুলি ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে তার পায়ের কাছে। ঠিক যেন কোন অভাগিনী নারী তার পদতলে মাথা কুটে কুটে কেঁদে মরছে।

বনহুর সিগারেট পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে।

হঠাৎ কালো লঘু পদক্ষেপের শব্দে ফিরে তাকালো বনহুর। চমকে উঠলো সে, জ্যোছনার আলোতে স্পষ্ট দেখলো—জুলেখা তার পিছনে দাড়িয়ে আছে। নির্বাক নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মত লাগছে তাকে।

বনহুর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো—আপনি!

জুলেখার ঠোঁট দু'খানা নড়ে উঠলো, কোন কথা বের হলোনা।

বনহুর বললো—চলুন বাংলোয় ফিরে যাই।

জুলেখা শান্ত—কণ্ঠে বললো—বসুন না আর একটু।

এখানে এই নির্জন সাগার—সৈকত আপনার পক্ষে নিরাপদ নয় মিস্ জুলেখা।

কোন ভয়ের সম্ভাবনা আছে নাকি মঞ্জুর সাহেব?

আছে বই কি? দস্যু বনহুরকে জানেন তো?

দস্যু বনহুর। গলাটা কেঁপে গেলো জুলেখার—কেনো বলুন তো? আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো সে বনহুরের পাশে।

দস্যু বনহুর হঠাৎ যদি এসে পড়ে এখানে? জানেন তো সে এখন মুক্ত রয়েছে।

দস্যু বনহুর এখানে আসবে?

তার অসাধ্য কিছু নেই।

সত্যি, দস্যু বনহুর দেশ ও দশের শত্রু।

কি করে বুঝলেন দস্যু বনহুর দেশ ও দশের শত্রু?

শুনেছি দস্যু বনহুর যে কোন মুহুর্তে যার তার উপরে হামলা করে তার সর্বস্ব লুটে নেয়। সমস্ত শহরের প্রতিটি নাগরিক তার ভয়ে সদা কম্পমান রয়েছে। নিরীহ জনগণের বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে তার এতোটুকু বাধে না। এমন কি যে কোন যুবতী বা নারীকে সে দেখলে অপহরণ করে নিয়ে যায়--

এমন দস্যুর বাস যে দেশে সে দেশে গভীর রাতে নির্জন সাগর তীরে কখনই নিরাপদ নয় চলুন।

বনহুর অগ্রসর হলো।

জুলেখা অগত্যা ফিরে চললো তার সঙ্গে।

কোনো এসেছিলো কি বলতে চেয়েছিলো, কোন কথাই বলা হলোনা।

ওদিকে মনিরার ঘুম ভেংগে গিয়েছিলো পাশের বিছানায় জুলেখার নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছেনা কেনো। দৃষ্টি শক্তি নেই যে তাকিয়ে দেখবে সে। মনিরা নিজের নিশ্বাস বন্ধ করে কান পাতলো না, কিছুই শোনা যাচ্ছেনা। ডাকলো মনিরা এবার—জুলেখা,জুলেখা--

কোন সাড়া শব্দ নেই।

মনিরার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে উঠলো। তবে কি জুলেখা বিছানায় নেই মনিরা উঠে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেলো জুলেখার বিছানার পাশে। বিছানায় হাত বুলিয়ে তার সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো—জুলেখা বিছানায় নেই শূন্য শয্যা পড়ে রয়েছে। মনিরার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হলো। কোথায় গেছে, কেনো গেছে---তবে কি---তবে কি তার স্বামীর কক্ষে জুলেখা---

ঠিক সেই মুহুর্তে শুনতে পেলো মনিরা বাংলোর বাইরে পুরুষ ও নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি।

জুলেখার কণ্ঠে—গুড্ নাইট।

পরক্ষণেই তার স্বামীর কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেলো মনিরা—গুড্ নাইট---

মনিরার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। জুলেখা কক্ষে প্রবেশ করার পূর্বেই মনিরা নিজের শয্যায় এসে নিশ্চুপ শুয়ে পড়লো, নিস্পন্দ অসারের মত। একটু টু শব্দ সে করতে পারলো না। চোখে না দেখলেও অনুভব করলো— জুলেখা সন্তর্পণে শয্যায় এসে শুয়ে পড়লো।

পাশের কক্ষেও দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে ভেসে এলো মনিরার। তার স্বামী দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লো—বুঝতে পারলো সে। মনিরার সন্দেহ দৃঢ় হলো, নিশ্চয়ই জুলেখার সঙ্গে তার স্বামীর গোপন প্রেম জন্মে গেছে।

মনিরার বুকের মধ্যে কে যেন লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে দিচ্ছিলো অসহ্য সে যন্ত্রণা। মুখে কোন কথা না বললেও বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছিলো তার।

জুলেখা ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু মনিরার চোখে আর ঘুম আসে না। আজ যেন সে তার যথাসর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছে। অন্ধ হয়েও তার মনে এতো দুঃখ ছিলো না, আজ তার জীবনের সবকিছু যেন শূন্যতায় ভরে উঠেছে। জুলেখার প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তার স্বামী--মনিরা আর ভাবতে পারে না। অন্ধ হলেও তার মনের পর্দায় দেখতে পায়—বনহুর আর জুলেখা, ওরা দু'জনা পাশাপাশি পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে উঁচু—নীচু পথ—বনহুর জুলেখার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে জুলেখা হাসছে— ওর হাতে হাত রেখে সন্তর্পনে চলছে। হাসছে ওরা দু'জনো দু'জনের দিকে তাকিয়ে! মনিরা দুই হাতে চোখ ঢেকে ফেলে কিন্তু মন থেকে তো মুছে ফেলতে পারে না। দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে উঠে একটির পর একটি করে---সাঁওতাল পল্লী—বনহুর আর জুলেখা বসে আছে পাশাপাশি। সম্মুখে নাচ দেখাচ্ছে ভীলবালাগণ। বনহুর আর জুলেখা দু'জন তাকাচ্ছে হাসছে উভয়ে। মনিরা আর ভাবতে পারে না, দুই হাতে মাথা টিপে ধরে শক্ত করে।

তারপর মনিরা আর নিজকে ধরে রাখতে পারে না, শয্যাত্যাগ করে নেমে দাঁড়ায় নীচে। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলে হাতড়ে হাতড়ে।

পাশের বিছানায় জুলেখার নাসিকার শব্দ হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। জুলেখা।

মনিরা দেয়াল হাতড়ে এগুতে লাগলো। অতি ধীরে ধীরে দরজার খিল খুলে ফেললো মনিরা, বেরিয়ে এলো বাইরে। সমস্ত পৃথিবী আলোর বন্যায় ঝলমল করছে কিন্তু মনিরার চোখে সব অন্ধকার।

মনিরা এগিয়ে চললো বাংলোর বারান্দা বেয়ে সম্মুখের দিকে।

দেয়াল ধরে ধরে এগুচ্ছে মনিরা। কোন দিকে ওর খেয়াল নেই। বাড়ির সিড়ির ধাপ বেয়ে বাংলোর বারেন্দা থেকে নেমে পড়লো। হোচট খেয়ে পড়ে গেলো একবার আবার উঠে দাঁড়ালো। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে

পড়লো পিঠের উপর। আঁচলটা খসে লুটোপুটি খেতে লাগলো মাটির মধ্যে। মনিরা এলো-পাথারী অগ্রসর হচ্ছে। কানে ভেসে আসছে সমুদ্রের জলরাশির উচ্ছল কল কল শব্দ।

মনিরা সমুদ্রের দিকে এগুতে লাগলো। জীবনের উপর তার একটা ধিক্কার এসে গেছে। কি হবে এ জীবন রেখে যার সব গেছে--সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। যার দৃষ্টি শক্তি নেই। নেই যার সম্বল বলতে কিছু --কি হবে তার জীবন রেখে। মনিরা সমুদ্রে ঝাপিয়ে আত্মবিসর্জন দেবে।

উঠছে পড়ছে, আবার এগুচ্ছে সম্মুখের দিকে। কখনও পাথরে হোচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ভূতলে! মাথার একস্থানে পাথরের আঘাত লেগে কেটে গেলো অনেকটা। দর দর ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

মনিরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত এগিয়ে চলেছে। চোখে সে দেখতে না পেলেও কানে শুনতে পাচ্ছে সমুদ্রে জলোচ্ছাসের শব্দ। সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগুচ্ছে মনিরা।

❑

দারোয়ানের উচ্চকণ্ঠে ঘুম ভেংগে গেলো বনহুরের, দড় বড় দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

দারোয়ান ব্যস্তকণ্ঠে বললো—হুজুর, ছোট মেম সাহাব দরিয়া কিনার মে চলা গিয়া---

দরিয়া কিনারে! অস্ফুট ধ্বনি করলো বনহুর। কোন ছোটা মেম সাহেব দারোয়ান?

আন্ধা মেম সাহাব---

দারোয়ানের কথা শেষ হয়না, বনহুর স্লিপিং গাউনে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ছুটলো সমুদ্রতীর অভিমুখে।

মনিরা তখন ঠিক সমুদ্রতীরে উঁচু একটা স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, আর এক মুহুর্ত, তাহলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সমুদ্র বুকে।

ঠিক সেই ক্ষণে বনহুর ধরে ফেললো মনিরাকে—মনিরা।

মনিরা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ নির্বাক হয়ে গেলো।

বনহুর পুনঃ পুনঃ তার শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—মনিরা। কেনো তুমি এ কাজ করতে যাচ্ছিলে? বলো—বলো মনিরা কেনো তুমি সমুদ্রে জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলে? মনিরা ---মনিরা--

মনিরা এবার উচ্ছাসিতভাবে কেঁদে উঠলো—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে, মরতে দাও---

কি হয়েছে তোমার? কি হয়েছে মনিরা,বলো? বনহুর মনিরাকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

আমি অন্ধ আমি দৃষ্টিশক্তিহীন আমি পঙ্গু—তোমার উপযুক্তা আমি নই। আমাকে তুমি ত্যাগ করো, ওগো আমাকে তুমি ত্যাগ করো।

এবার বনহুর কঠিন গর্জন করে উঠলো—মনিরা।

না না, আমাকে তুমি মরতে দাও?

কেনো মরতে এতো সখ বলবে তো?

মরবার সখ আমার নে, কিন্তু বাধ্য হচ্ছি আমি নিজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে?

কেনো?

জুলেখাকে তুমি বিয়ে করো---

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর—জুলেখাকে বিয়ে করবো! গম্ভীর হয়ে পড়লো বনহুর মনিরাকে মুক্ত করে দিয়ে বললো সে—কেনো?

মনিরা না বলে পারলো না; বললো এবার মনিরা—জুলেখা আর তোমার মধ্যে---থেমে পড়লো তারপর বললো সে—আমি অন্ধ হলেও অজ্ঞান নই—সব জানি, সব বুঝতে পারি।

এ সব কি আবোল—তাবোল বলছো মনিরা?

কিছুক্ষণ পূর্বেই তুমি আর জুলেখা গোপনে বাংলো থেকে বেরিয়ে যাওনি?

বনহুর এবার সব বুঝতে পারে, কিছু আগে জুলেখা ও তার আগমন টের পেয়েই মনিরা এমনভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছে।

মনিরার মনে সন্দেহ জেগেছে তার এবং জুলেখার উপর।

বনহুর হেসে উঠলো হো হো করে তারপর হাসি থামিয়ে বললো—এ জন্যই তুমি প্রাণ বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলে? মনিরা তুমি বিশ্বাস রেখো তোমার স্বামীকে---

মনিরা বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

বনহুর বলে—মনিরা, কোনদিন আমার উপর তুমি বিশ্বাস হারিও না।

ওগো আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমাকে তুমি ক্ষমা করো---

এই ঘটনার কয়েকদিন পর বনহুর মনিরা আর জুলেখা ফিরে এলো কান্দাই শহরে। এক সপ্তাহ তারা কাটিয়ে এসেছে হরিদ্রা সাগর সৈকতে।

হরিদ্রা নির্জন সাগর তীরে বাংলোয় মনিরা আর জুলেখার মধ্যে যে একটা দন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিলো সেটা বনহুর সামলে নিয়েছিলো অত্যন্ত সাবধানে। কারণ এখন জুলেখাকে তাদের একান্ত প্রয়োজন। মনিরার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য জুলেখা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বনহুর মনিরার জন্য সব ত্যাগ করে পড়ে আছে এখানে। ওদিকে আস্তানায় তার দলবল না জানি কি করছে। নূরী হয়[illegible] কেঁদে কেঁদে সারা হলো। কাউকেই বলে আসেনি বনহুর। ভিতরে ভিতরে সে আস্তানার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলো কিন্তু সব চিন্তার চেয়ে তার মনে আঘাত হানছিলো মনিরার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার চিন্তা। মনিরার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে না পারলে তার সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কান্দাই ফিরেই বনহুর আস্তানায় ফিরে যাবার জন্য উৎগ্রীব হয়ে উঠলো। জুলেখার নিকট বললো সে—আমি কয়েকদিনের জন্য দেশে যেতে চাই। আপনি মনিরার দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

জুলেখার নিকটে কথাটা আনন্দদায়ক বলে মনে হলোনা।

মঞ্জুর সাহেবের মনিরার প্রতি অনুরাগ দেখে মনের মধ্যে একটা অহেতুক ঈর্ষা জাগছিলো। অন্ধ মনিরার জন্য তার এতো প্রাণের টান কেনো ভেবে পায়না জুলেখা।

বনহুরের কথায় জবাব দেয় সে—আপনি চলে গেলে সত্যি আমি মনে ব্যথা পাবো মঞ্জুর সাহেব।

জুলেখার কণ্ঠস্বরে আবেগ মাখানো ছিলো, বনহুর গম্ভীর হয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগলো। তারপর হেসে বললো—মিস্ জুলেখা আমিও আপনাদের সান্নিধ্য ছেড়ে বেশীদিন বিলম্ব করতে পারবোনা। বিশেষ করে আপনার মধুময় ব্যবহার আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

জুলেখা বনহুরের কথায় আত্মহারা হয়ে যায়। নিজকে যেন হারিয়ে ফেলে সে বনহুরের হাতের উপর হাত রেখে—সত্যি বলছেন?

সত্যি।

বনহুর এরপর আর বিলম্ব করেনি জুলেখার লেবরেটরী কক্ষে। মনিরার কাছে বিদায় নিয়ে বনহুর ফিরে এলো তার আস্তানায়।

❑

রহমান এবং অন্যান্য সবাই দস্যু বনহুরের অনুচরগণ তাদের সর্দারের অকস্মাৎ অন্তর্ধানে ভয়ানকভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। রহমান গোপনে শহরে অনুসন্ধান নিয়েও সর্দারের কোন সন্ধান পায়নি। চৌধুরী বাড়ী গিয়েও দেখা পায়নি সে মনিরার। সে তবে নকীরের মুখে শুনেছিলো মনিরার চক্ষু চিকিৎসার জন্য তাকে কান্দাই এর কোন এক চক্ষু চিকিৎসকের নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এর বেশী রহমান জানতে পারেনি কিছু।

নূরীর মন অত্যন্ত খারাপ ছিলো, লোকে যে যাই বলুক বনহুরকে সমস্ত অন্তর দিয়ে সে ভালবাসে। বনহুরের জন্য সব সময় আনমনা থাকে সে। শত বাধা—বিঘ্নও নূরীকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেনা বনহুরের চিন্তা থেকে। যদিও মনিকে নিয়ে নূরী সকল সময় ব্যস্ত থাকতো তবু বিমর্ষ হয়ে কাটাতো সর্বক্ষণ।

হঠাৎ সর্দারের অন্তর্ধানে নূরী চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ভীষণভাবে, বুঝতে পেরে জোবাইদা ভিতরে ভিতরে খুশীই হয়।

এমন দিনে ফিরে এলো সর্দার সুস্থ সবলদেহে।

নূরী সংবাদ পেয়ে ছুটে এলো বনহুরের পাশে; খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল।

বনহুর এগিয়ে আসতেই মনি এসে জাপটে ধরলো—বাপি।

বনহুর মনিকে তুলে নিলো কোলে, গালে মৃদু চাপ দিয়ে আদর করে বললো—কেমন আছ মনি?

মনি কিছু বলবার পূর্বেই হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো দরজার দিকে—সুতীক্ষ্ণধার একখানা ছোরা হস্তে দাঁড়িয়ে আছে জোবাইদা, দরজার একপাশে আড়ালে।

বনহুর মনিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলো, তারপর বললো—নূরী, যাও মনিকে খেলা দাও গে।

হঠাৎ বনহুরের গম্ভীর অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করে নূরী আর কোন কথা বলেনা মনিকে কোলে করে বেরিয়ে যায় সে।

মনি আর নূরী চলে যেতেই বনহুর দরজার আড়াল থেকে জোবাইদার হাত ধরে টেনে বের করে আনে—দক্ষিণ হস্তে তার তীক্ষ্ণ ধার ছুরি। মশালের আলোতে জোবাইদার হাতে ছোরাখানা ঝক মক করে উঠে।

বনহুর বুঝতে পারে—জোবাইদা তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই তার কক্ষের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলো। নূরী বা মনিকে হত্যা তার মনোভাব হলে সে অনেকভাবে তাদের হত্যা করতে পারতো আর এভাবে লুকিয়ে থাকার তার প্রয়োজন ছিলো না।

বনহুরের সম্মুখে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো জোবাইদা।

সত্যই সে আজ বনহুরকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এখানে এইভাবে আত্মগোপন করেছিলো। আজ অনেকদিন থেকে জোবাইদা নিজের মনের সঙ্গে দন্দ্ব করেছে। স্মরণ হয়েছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, অতীত হাতড়ে দেখতে পেয়েছে—বনহুরের উপেক্ষা ছাড়া কোনদিন এতোটুকু প্রীতি সে পায়নি। অনুগ্রহের কাঙ্গাল সে নয়, সে চায় বনহুরের হৃদয়ের এতোটুকু নিবিড় অনুভূতি। কিন্তু যা জোবাইদা চেয়েছে তা কোনদিনই পায়নি, পাবেও না জীবনে। সমস্ত অন্তর দিয়ে সে চেয়েছিলো বনহুরের একটুখানি ভালবাসা। নারী—হৃদয় যেমনি কোমল তেমনি বিষময় হয়ে উঠে কখন , যখন সে তার কামনার বস্তু থেকে বিমুখ হয়। তখন সে হয়ে উঠে ভয়ঙ্করী। জোবাইদা তার সমস্ত আশা—আকাঙ্খা থেকে হতাশ হয়েছে। বিষধর নাগিনীর মত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে সে। যা সে পাবেনা কোনদিন সে জিনিস অপরকেও দেবেনা ভোগ করতে, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে পড়ে জোবাইদা এবং সেই কারণেই আজ সে বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে গোপনে লুকিয়েছিলো—বনহুরকে হত্যা করবে সে।

বনহুর জোবাইদার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার চোখে মুখে ক্রুদ্ধ ভাব নয় বা কোন রকম রাগান্বিত হয়নি বনহুর। স্বাভাবিক মুখভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে জোবাইদার মুখের দিকে।

বনহুর বুদ্ধিহীন নয়—সে জোবাইদার মনোভাব অনেক দিন লক্ষ্য করেছে। ছোট বেলার সাথী হিসাবে বনহুর কোনদিন জোবাইদাকে অবহেলা করেনি। যতটুকু পেরেছে সমীহ করে চলেছে, স্নেহ—মায়া মমতা দিতে কার্পণ্য করেনি কোনদিন, কিন্তু জোবাইদা এতে খুশী হয়নি। বনহুর নিভৃতে ভেবেছে কতদিন—শুধু জোবাইদার কথা নয়, এমনি আরও কত নারীর প্রেমাশ্রুই তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। নিজকে সংযত রাখতে গিয়েও মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে পড়েছে, কিন্তু পদঙ্খলন ঘটেনি তার কোনদিন।

বনহুর জোবাইদার মনোভাব বুঝতে পেরেই রাগান্বিত বা ক্রোধান্বিত হতে পারলেনা। এই মুহূর্তে যদি তার অনুচরগণের কেউ জানতে পারে, জোবাইদা সর্দারকে হত্যার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, তাহলে জোবাইদাকে প্রাণ নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে না। শুধু হত্যাই করবেনা, তাহার সমস্ত দেহে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

বনহুর বললো—জোবাইদা তুমি যে কারণে এখানে আত্মগোপন করেছিলে, আমি বুঝতে পেরেছি। বেশ, তুমি আমাকে হত্যা করে যদি সুখী হও তবে তাই হোক। আমাকে তুমি হত্যা করো। শোন আমাকে হত্যা করার পর নিশ্চয়ই তুমি নিজকে গোপন রাখতে পারবেনা, হয়তো ধরা পড়ে যেতে পারো। তখন রহমান বা আমার অনুচরগণ তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেনা। তাই আমি তোমাকে একটা গোপন পথের সন্ধান বলে দেবো, যে পথে তুমি আমাকে হত্যা করার পর অতি নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আমার আস্তানার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দেয়ালে একটি ছোট চাকার মত চাবি আছে। খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে এই চক্রাকার চাবিটি তোমার দৃষ্টিতে ধরা পড়বে, তুমি সেই চাবিটি দক্ষিণ দিকে একটু চাপা দিলেই ছোট্ট একটা সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে আসবে সেই পথে তুমি ফিরে যেতে পারবে পৃথিবীর বুকে। যেখানে খুশী চলে যেও আর কেউ তোমার সন্ধান পাবেনা। করো, হত্যা করো আমাকে ---বনহুর বুক পেতে দেয় জোবাইদার সম্মুখে।

জোবাইদা নত দৃষ্টি তুলে তাকায় বনহুরের মুখে।

সৌম্য—সুন্দর অপরূপ একখানা মুখমুদিত দুটি আঁখি। জোবাইদার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হলো,হস্তস্থিত ছোরাখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে লুটিয়ে পড়লো বনহুরের পায়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো জোবাইদার পিঠে। তীব্র আর্তনাদ করে মুখ ধুবড়ে পড়ে গেলো জোবাইদা বনহুরের পায়ের উপর।

বনহুর বিস্ময় ভরা চোখে তাকালো প্রথমে জোবাইদার লুণ্ঠিত দেহের দিকে পরক্ষণেই ওদিকের মুক্ত জানালার দিকে দৃষ্টি পড়লো। একখানা হাত দ্রুত সরে গেলো জানালার পাশ থেকে। বনহুর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের একস্থানে চাপ দিলো সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আস্তানায় একটা সংকেতসূচক শব্দ ধ্বনিত হতে লাগলো।

শব্দটা সমস্ত আস্তানায় ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তে।

আস্তানার প্রবেশ পথে এবং সমস্ত স্থানে স্থানে রাইফেলধারী দস্যুগণ সজাগ হয়ে দাঁড়ালো। একটি প্রাণী যেন আস্তানার বাইরে যেতে না পারে, এই সংকেত ধ্বনির একটা ইংগিৎ।

রহমান-ও বিশিষ্ট কয়েকজন অনুচর ছুটলো বনহুরের কক্ষ অভিমুখে।

বনহুর তখন জোবাইদার পিঠ থেকে ছোরাখানা খুলে নিয়েছে। জোবাইদার মাথাটা তখন তার কোলে।

রহমান বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালো। জোবাইদার রক্তমাখা ভুলুণ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়লো। ততক্ষণে কায়েসও অন্যান্য কয়েকজন অনুচর গুলীভরা রাইফেল হস্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলেরই চোখে —মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

সর্দারের কক্ষে জোবাইদাই বা এলো কি করতে এবং তাকে এভাবে ছোরাবিদ্ধ করলো কে সব যেন কেবল এলোমেলো লাগছে অনুচরদের কাছে।

রহমান ও অনুচরদের দিকে তাকিয়ে বনহুর ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো —আস্তানা থেকে আমাদের একজনও যেন বাইরে না বের হতে পারে।

রহমান বললো—সর্দার, সংকেত ধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাহারাদারগণ আস্তানার সমস্ত গুপ্তপথের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তারা সাবধানে পাহারা দিচ্ছে। একটি প্রাণীও আস্তানার বাইরে যেতে সক্ষম হবেনা! কিন্তু জোবাইদাকে কে এ ভাবে ছোরাবিদ্ধ করলো সর্দার?

ঐ প্রশ্ন আমার মনেও রহমান---কিন্তু সব কথা পরে হবে, তুমি শীঘ্র ঔষধ আনার ব্যস্থা করো যাও রহমান---

বনহুরের কথা শেষ হয়না, জোবাইদা ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠে—ঔষধ আর আনতে হবেনা--সর্দার, আমি তোমাকে হত্যা ---করতে এসেছিলাম ---পারলামনা-----আমাকে তোমার শত্রু জেনেও---তুমি আমাকে ক্ষমা---করলে---আঃ---আঃ- উঃ বড্ড কষ্ট হচ্ছে--আমার---

জোবাইদা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর বনহুরের। চোখে—মুখে তার ফুটে উঠেছে একটা ব্যথা করুণ ভাব।

রহমান ঔষধ আনতে যায়নি এখনও যেতে পারেনি সে। জোবাইদার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিলো। কায়েস চলে গেছে ঔষধ আনতে অবশ্য রহমানের ইংগিতেই গেছে সে।

বনহুর জোবাইদার মাথার চুলে—কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। মাঝে মাঝে তার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে আসছে—জোবাইদা ---জোবাইদা---

জোবাইদা বেশ হাপিয়ে পড়েছিলো খুব কষ্ট হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট ভাবে।

বলছে জোবাইদা—আমাকে যে হত্যা করলো তাকে আমি--দেখেছি কিন্তু আমি বলবোনা--আমি তাকে ক্ষমা করলাম —সর্দার, সে যদি ---ধরা পড়ে- যায়---তাকে --তুমি --ক্ষমা --ক--রো--

জোবাইদার মাথাটা বনহুরের কোলের উপর কাৎ হয়ে ঢলে পড়লো।

বনহুরের কণ্ঠ দিয়ে একটি শব্দ আর উচ্চারণ হলো না। চিত্রার্পিতের মত বসে রইলো স্থির হয়ে কিছুক্ষণ। জোবাইদার কথা গুলিই পুনরাবৃত্তি হচ্ছিলো তার মনের মধ্যে---আমাকে যে হত্যা করলো তাকে আমি দেখেছি--কিন্তু আমি বলবোনা---আমি তাকে ক্ষমা করলাম--

বনহুর লক্ষ্য করেছে—জোবাইদা যখন তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো তখন জোবাইদা একবার তাকিয়ে দেখেছিলো ওদিকের জানালাটা। যে জানালায় একটু পূর্বে বনহুর একখানা হাতকে দ্রুত সরে যেতে দেখছিলো।

কায়েস ঔষধ হস্তে ফিরে এলো কক্ষ মধ্যে।

বনহুর বললো—ঔষধ আর লাগবেনা কায়েস। জোবাইদা চির বিশ্রাম নিয়েছে। জোবাইদার মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রাখলো বনহুর।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর, গম্ভীর কঠিন তার মুখভাব বললো সে—রহমান এই মুহূর্তে জোবাইদার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করো। আমার অনুচরদের মধ্যেই কেউ তাকে ছোরা নিক্ষেপ করেছে। কে সে পাপিষ্ঠ তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আমি শপথ করলাম —তাকে আমি নিজ হস্তে শাস্তি দান করবো।

রহমানের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো, গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে বললো—সর্দার আমিও শপথ করছি যে জোবাইদার জীবন নাশ করলো তাকে আমি খুঁজে বের করবোই। আমার নিজের পিতা হলেও আমি তাকে মাফ করবো না।

জোবাইদার লাশ কান্দাই বনে দাফন করবার জন্য আদেশ দিলো বনহুর।

সমস্ত আস্তানা ব্যাপী একটা মহা হইচই পড়ে গেলো। কে হত্যা করেছে জোবাইদাকে কে সে ভয়হীন পাপিষ্ঠ?

বনহুর আস্তানার প্রত্যেকটা অনুচরকে তার দরবার কক্ষে আহ্বান জানালো।

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট দস্যু বনহুর।

সমস্ত শরীরে তার জমকালো ড্রেস, দস্যুর পোষাক। মুখমন্ডল কঠিন গাম্ভীর্যপূর্ণ, চোখ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

আসনের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান প্রত্যেকটা অনুচরের মুখোভাবে ফুটে উঠেছে একটা ভয়ার্তভাব।

বনহুর গর্জন করে উঠলো—জোবাইদাকে তোমরা কে হত্যা করেছো?

সমস্ত অনুচরগণ একবার মুখ তুলে তাকালো তাদের সর্দারের দিকে। আবার মাথা নত করে দাঁড়ালো সবাই, কারো মুখে কোন শব্দ বের হলো না।

বনহুর বুটের আঘাত করলো ভূতলে—জবাব দাও কে জোবাইদার জীবন নাশ করেছো? জবাব দাও?

সবাই এক সঙ্গে কম্পিত কণ্ঠে বললো—সর্দার, আমরা কেউ জোবাইদার জীবন নাশ করিনি।

একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো নূরী, বনহুর একবার সকলের অলক্ষ্যে তাকিয়ে দেখে নিলো নূরীর মুখোভাব। তার পাশে দাঁড়িয়ে নাসরিন আর বৃদ্ধা দাইমা, মনিও দাঁড়িয়ে আছে নূরীর পাশে।

আজকের দরবারে আস্তানার কেউ বাদ যায়নি, এমনকি বৃদ্ধা দাইমা এবং মনিও উপস্থিত ছিলো।

বনহুর প্রত্যেকের মুখভাব লক্ষ্য করে দেখছিলো।

কিন্তু কারো মুখোভাবে কোন রকম সন্দেহজনক লক্ষণ বনহুরের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো না।

বনহুর এবার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। সম্মুখের পাথরের টেবিলে জোবাইদাকে যে চোরা দ্বারা নিহত করা হয়েছিলো, সেই ছোরাখানা একটি থালার উপরে রাখা হয়েছে। বনহুর তুলে নিলো ছোরাখানা হাতে তারপর আসন ত্যাগ করে নেমে এলো, অনুচরগণের সম্মুখে এক এক করে ছোরাখানা তুলে ধরলো—কার এ ছোরা, জবাব দাও?

বনহুর ছোরাখানা যখন যার সম্মুখে ধরছিলো তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার মুখোভাব লক্ষ্য করছিলো। ছোরাখানা আসল অধিকারীর সন্ধানই বনহুরের উদ্দেশ্য।

আশ্চর্য হলো বনহুর যখন ছোরাখানা নাসরিনের সম্মুখে উঁচু করে ধরে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—এ ছোরাখানা তোমার কি না?

নাসরিনের মুখভাবে একটা বিস্ময়ভাব জেগে উঠলো মুহূর্তের জন্য পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়ে বললো নাসরিন —সর্দার ছোরাখানা আমার নয়।

নাসরিনের কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলো যেন।

বনহুরের ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠলো, গর্জন করে উঠলো বনহুর—রহমান, নাসরিন ছোরাখানা চিনতে পেরেছে।

বনহুরের ইংগিতে রহমান ও আরও কয়েকজন অনুচর নাসরিনের চারি পাশে রাইফেল উদ্যত করে ধরলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নাসরিনকে মজবুত বরে বেঁধে ফেলা হলো।

বনহুর বললো— তুমি এই হত্যা ব্যাপারে অবগত আছো আমি বুঝতে পেরেছি নাসরিন। যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে স্পষ্ট করে বলো—কার এ ছোরা, কে সে হত্যাকারী।

নাসরিন নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো কোন জবাব দিলো না।

বনহুর এবার রহমানকে আদেশ দিলো—নাসরিন যতক্ষণ না জোবাইদার হত্যাকারীর নাম বলেছে ততক্ষণ তাকে অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী করে রাখবে এবং রোজ তাকে শাস্তিদানপূর্বক আসল কথা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবে।

তখনকার মত দরবার শেষ হলো।

অনুচরগণের মধ্যে এতোক্ষণ একটা ভীতিকর ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিলো সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যদিও তারা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নয়, কারণ এখনও জোবাইদার হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। নাসরিনকে বন্দী করা হলো সন্দেহজনকভাবে। নাসরিনের বলার উপর এখন নির্ভর করছে জোবাইদার হত্যাকারীর জীবন।

কে সে হত্যাকারী, কি-ই বা উদ্দেশ্য ছিলো তার জোবাইদাকে হত্যা করার পিছনে?

বনহুর দরবার কক্ষ ত্যাগ করলো। রহমানও তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলো।

কয়েকজন অনুচর নাসরিনকে বন্ধন অবস্থায় নিয়ে চললো অন্ধ কারাগার অভিমুখে।

❑

দু'দিন পর।

বনহুর তার নিজের কক্ষে শয্যায় বসা।

রহমান তার সম্মুখে দন্ডায়মান।

বনহুর বললো—রহমান আজ থেকে তিন দিন পূর্বে জোবাইদা নিহত হয়েছে।

হ্যাঁ, সর্দার।

আজও জোবাইদার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা সম্ভব হলো না। একটু নিশ্চুপ থেকে বললো আবার বনহুর—আমার আস্তানাতেই আছে জোবাইদার হত্যাকারী আমি বুঝতে পেরেছি।

সর্দার।

হাঁ, আমি ফিরে এসে বিচার করবো। রহমান তুমি সমস্ত আস্তানায় সতর্ক পাহারা নিযুক্ত রাখবে—আমার আস্তানা ছেড়ে একটি প্রাণীও যেন বাইরে না যায়।

রহমান নত মস্তকে বললো—আদেশ ঠিকভাবেই পালন হবে সর্দার।

বনহুর উঠে এবার পায়চারী করতে লাগলো। ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তারেখা।

রহমান সর্দারের মুখোভাব লক্ষ্য করে চিন্তিত হলো।

বনহুর কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো—রহমান তাজকে প্রস্তুত করো আমি এক্ষুণি রওয়ানা দেবো। কথা শেষ করে শয্যায় এসে বসলো বনহুর।

রহমান কুর্নিশ জানিয়ে প্রস্থান করলো।

বনহুর তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো।

রহমান কুর্নিশ জানালো সর্দারকে। অন্যান্য অনুচরগণ তারাও কুর্নিশ জানিয়ে তাজের দুই পাশে সরে দাঁড়ালো।

বনহুর লক্ষ দিয়ে তাজের পিঠে উঠে বসলো।

বহুদিন পর তাজ প্রভুকে নিজ পৃষ্ঠে পেয়ে আনন্দিত হলো, সম্মুখের পা দু'খানা উঁচু করে শব্দ করে উঠলো—চিঁ চিঁ ---

তারপর ছুটতে শুরু করলো তাজ।

ভূগর্ভের সুড়ঙ্গ পথ প্রকম্পিত হয়ে উঠলো তাজের পদ শব্দে।

নিমিষে অশ্বপৃষ্ঠে রহমান নূরী, অদূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলো সে।

রহমানা এগিয়ে এলো নূরীর পাশে।

নূরী জিজ্ঞাসা করলো—বনহুর কোথায় চললো রহমান?

সর্দার কোনদিন বলে যায়না নূরী, তবে হাঁ যখন বলার মত হয় বলে যায় বটে। আচ্ছা নূরী, আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি আজকাল সব সময় সর্দারকে এড়িয়ে চলো কেনো? কই আজ সে কোথায় গেলো বা যাচ্ছে—একটিবার কাছেও এলেনা জিজ্ঞাসাও করলেনা—ব্যাপার কি বলো তো?

নূরী একটু ম্লান হাসি হেসে বললো—বনহুরের পাশে যাওয়া আমার মানা তুমি বুঝি জানোনা?

ও তাই নাকি, কিন্তু এতোদিন তো কোন মানা ছিলোনা।

ছিলোনা কিন্তু---নূরী কিছু বলতে গিয়ে থেমে পড়লো।

রহমান আর নূরী এগুচ্ছে আস্তানার অভ্যন্তরে।

বললো রহমান—আস্তানার অনেকেই তোমার আর সর্দারের মিলামিশা ভাল নজরে দেখতোনা। এ নিয়ে অনেক কথাও উঠেছে আস্তানায় অনুচরদের

মধ্যে। কিন্তু সর্দারের ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহসী হয়নি। একমাত্র জোবাইদাই প্রতিবাদ জানিয়েছিলো এ ব্যাপারে।

হ্যাঁ জোবাইদাই প্রতিবাদ জানিয়েছিলো।

আচ্ছা নূরী?

বলো রহমান।

জোবাইদাকে আমাদের আস্তানায় কোন ব্যক্তি ছোরা নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে তাই নয় কি?

জানিনা সে কথা।

জানোনা কিন্তু আস্তানার সকলকেই এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। সর্দার নাসরিনকে বন্দী করে রাখলেও আসল হত্যাকারীর সন্ধান তিনি জানেন।

নূরী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—তাহলে তুমি তাকে হত্যা করেছো রহমান?

আমার সঙ্গে জোবাইদার মনোমালিন্যের কারণ?

কিছু না থাকলেও জোবাইদার এমন কোন কাজ করতে যাচ্ছিলো যার জন্য বনহুরের যে কোন অনুচর তাকে হত্যা করতে পারে।

নূরী তুমি তাহলে জোবাইদা হত্যা—রহস্য অবগত আছো?

রহমান, আমাকে তুমি অবিশ্বাস করছো?

হাসলো রহমান—তোমাকে অবিশ্বাস করবার মত সাহস আমার আছে নাকি? কিন্তু নূরী মনে রেখো—জোবাইদাকে যেই হত্যা করে থাকুক না কেনো সর্দার জানেন।

নূরী আর কোন কথা বলে না চলে যায় সে নিজের কক্ষের দিকে।

রহমানের ভ্রূকুঞ্চিত হলো।

রাত বেড়ে আসছে দেখে রহমান চলে গেলো তার দলবলকে সজাগ করে দিতে—একটি প্রাণীও যেন আস্তানার বাইরে যেতে না পারে। নিজেও সে রাইফেল হস্তে ঘুরে ঘুরে সব দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

সমস্ত আস্তানা ঝিমিয়ে পড়েছে।

যে যার বিশ্রাম স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছে।

কয়েকজন সশস্ত্র দস্যু কড়া পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে তাদের ভারী বুটের আঘাতে পাথুরিয়া মাটিতে প্রতিধ্বনি জাগছে খট্‌ খট্‌ খট্‌---

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দস্যু বনহুর এ আস্তানা তৈরী করেছে। কঠিন পাথর কেটে কেটে তৈরী হয়েছে সুড়ঙ্গ পথ। তিরিশ জন বলিষ্ঠ দস্যু অবিরত পরিশ্রম করেছে প্রায় এক বৎসরকাল। কান্দাই পর্বতের নীচে এই আস্তানা, আস্তানায় প্রবেশের সুড়ঙ্গমুখ পর্বতেরই একটি গুহার মধ্যে।

কান্দাই জঙ্গলের শেষ প্রন্তে এ পর্বত। পর্বতের পাদমূলে গহন জঙ্গল। বাইরের কোন লোক সমাজে এ জঙ্গলে ভুলেও প্রবেশ করতে সক্ষম হয়না।

হিংস্র জীবজন্তুর ভয় তো রয়েছেই—তাছাড়া এ জঙ্গলে দস্যু বনহুরের আস্তানা একথাও অনেকেরই জানা আছে। স্পষ্টভাবে না জানালেও লোক সমাজে আতঙ্কের সীমা নেই এ জঙ্গল সম্বন্ধে।

পুলিশ মহলেও জঙ্গল সম্বন্ধে নানারকম ধারণা আছে। একবার মিঃ জাফরী জঙ্গল মধ্যস্থ পোড়ো রাজবাড়ী আস্তানাতে হানা দিয়ে বনহুরের বহু সংখ্যক অনুচরকে হত্যা করেছিলো এবং কয়েকজনকে বন্দীও করেছিলো তারা। কিন্তু দস্যু বনহুর তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচররের সন্ধান পুলিশ বাহিনী পায়নি।

এই সংঘর্ষে শুধু দস্যু বনহুরের অনুচরই নিহত হয়নি, অনেক পুলিশ ফোর্সও জীবন দিয়েছিলো।

এই সংঘর্ষের পর দস্যু বনহুর নতুনভাবে তৈরী করেছিলো তার এই পর্বত তলে ভূগর্ভের আস্তানাটি। শুধু লোক চক্ষুর অন্তরালেই নয়, কোন ভূতত্ত্ববিদও সমস্ত বছর ধরে অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে না।

রহমান এই ভূগর্ভ আস্তানারই সতর্ক পাহারদার হিসাবে পাহারায় রত ছিলো।

আস্তানার বিভিন্ন স্থানের আলোগুলি এখন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

কোন কোন জায়গায় দেয়ালের গোঁজা মশাল থেকে নিভু নিভু আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিলো। সেই আলোকরশ্মি ভূগর্ভ আস্তানার গাঢ় অন্ধকারকে আরও বিভীষিকাময় করে তুলছিলো।

জোবাইদার মৃত্যুর পর সমস্ত অনুচরগণের মনে একটার গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিলো। দস্যু হলেও তারা তো মানুষ। মন—প্রাণ—হৃদয় সব আছে তাদের। জোবাইদার মৃত্যুতে আস্তানার অনেকেই দুঃখ পেয়েছিলো ভীষণভাবে। আবার অনেকের প্রাণে জেগেছিলো ভীতিভাব। না জানি জোবাইদার মৃত্যুর জন্য কার নসীবে কি আছে কে জানে।

রহমান রাইফেল হস্তে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিলো নিস্তব্ধ আস্তানার মধ্যে।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি তার সম্মুখ দিয়ে চলে গেলো। চমকে সরে দাঁড়ালো আড়ালে রহমান। পরক্ষণেই অনুসরণ করলো সে ছায়ামূর্তিটিকে। অতি অন্তর্পণে এগুতে লাগলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।

ছায়ামূর্তি এগুচ্ছে সম্মুখের দিকে।

রহমানের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করছে যদিও সে একজন নির্ভীক দস্যু। তবুও আজ কেনো যেন এমন একটা মনের মধ্যে দুর্বলতা বোধ করছে সে।

দস্যু বনহুরের আস্তানায় ছায়ামূর্তি।

কে এই ছায়ামূর্তি? রহমান রাইফেল ঠিক্ রেখে ছায়ামূর্তিটিকে অনুসরণ করলো।

ছায়ামূর্তি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

রহমান ফলো করছে তাকে।

দেয়ালের আড়ালে থামের পাশে আত্মগোপন করে অগ্রসর হচ্ছে ছায়ামূর্তি।

হঠাৎ রহমান বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। ছায়ামূর্তির পিছনে পিছনে সে অগ্রসর হচ্ছিলো। সম্মুখস্থ একটি দেয়ালের পাশে এসে ছায়ামূর্তি মুহূর্তে অদৃশ্য হলো।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান তার রাইফেল থেকে গুলী ছুড়লো, পর পর কয়েকটা, কিন্তু কোন আর্তনাদই ফুটে উঠলো না সেখানে।

রহমানের গুলীর শব্দে অন্যান্য অনুচরগণ ছুটে এলো অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে। এক একজনের চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। এই মুহূর্তে তারা যেন শত্রুকে পেলে পিষে মারবে এমনি সকলের মনোভাব।

কায়েস বললো—কি হয়েছে রহমান?

রহমানের চোখের ধাধা তখনও কাটেনি, কায়েসের প্রশ্নের জবাবে বললো সে—আশ্চর্য, জোবাইদার আত্মা এসেছিলো এখানে।

আত্মা! এক সঙ্গে কায়েস ও আরও কয়েকজন উচ্চারণ করলো।

রহমান বললো—হাঁ, জোবাইদার আত্মাই হবে, ঠিক সেই রকম পোষাক পরা একটা ছায়ামূর্তি আমি দেখেছি।

কোথায়? বললো কায়েস।

ঐখানে দেয়ালে মিশে গেছে।

দেয়ালে মিশে গেছে। আশ্চর্য তো?

হাঁ, আশ্চর্যই বটে। রহমান ধীরে ধীরে কথাটা উচ্চারণ করলো।

ততক্ষণে দাইমা, নূরী, মনিও ঘুম থেকে জেগে এসে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য অনুচরদের পাশে। রহমানের কথা শুনে সকলেই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ কম কথা নয়—জোবাইদার প্রেত আত্মা।

দস্যু বনহুরের আস্তানায় জোবাইদার প্রেত আত্মা।

সমস্ত আস্তানা জুড়ে একটা ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। জোবাইদার আকস্মিক মৃত্যুতে একেই সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিলো তারপর আবার প্রেত আত্মা---জোবাইদার প্রেত আত্মা।

□

বনহুর জুলেখার লেবরেটরীতে প্রবেশ করতেই জুলেখা আনন্দে আত্মহারা হয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালো —হ্যালো মঞ্জুর সাহেব।

বনহুর হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানালো—মিস্ জুলেখা, ভাল তো?

জুলেখার চোখে—মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে যেন, বললো সে—ভাল আছি, আপনি?

খুব ভাল না।

জুলেখা কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি টেনে বললো—কোন অসুখ—বিসুখ হয়নি তো?

না, শারীরিক নয়—মানসিক। মনিরা কেমন আছে?

জুলেখা গলার স্বর স্বাভাবিক করে নিয়ে বললো— মনিরা ভাল আছে। ওর চোখের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল।

ধন্যবাদ মিস জুলেখা। আপনার অনুগ্রহে মনিরা আজ তার হারানো দৃষ্টি ফিরে পেতে চলেছে---আচ্ছা ওর সঙ্গে দেখা করে আসি কেমন? বনহুর জুলেখার জবাবের প্রতীক্ষা না করে বেরিয়ে গেল লেবরেটরী হতে।

জুলেখা চিত্রাপিতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একটু পূর্বে যে মুখে রাশিকৃত আনন্দ ঝরে পড়ছিলো, নিমিষে সব আনন্দ কোথায় যেন উবে গেলো কর্পুরের মত। মুখমন্ডল অন্ধকার বিষণ্ন হয়ে উঠলো।

বনহুরের আগমনে জুলেখার মনে একটা অপূর্ব অনুভূতি দোলা জাগিয়েছিলো। খুশীর আবেগে আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিলো তার। ভুলে গিয়েছিলো মঞ্জুর সাহেব তার সীমার মধ্যে নয়।

সহকারী ডক্টর হামিদের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে আসে জুলেখার। ডক্টর হামিদ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেছেন—সিষ্টার রোগীকে বসিয়ে রেখে এসেছেন, সে এখন ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সরি। চলুন--একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে ত্যাগ করে অগ্রসর হলো জুলেখা।

একটি রোগীকে বসিয়ে এসেছিলো জুলেখা তার লেবরেটরী কক্ষে, জরুরী কোন একটা কাজে। এসে তখনই ফিরে যাবে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলো সে। মঞ্জুর সাহেব এসে পড়ায় তার বিলম্ব হয়ে গেছে।

জুলেখা রোগী দেখা শেষ করে ফিরে এলো তার লেবরেটরী কক্ষে। হঠাৎ মনে পড়লো মঞ্জুর সাহেবের কথা, তাছাড়া এখন মনিরার ইনজেকসানের সময় হয়েছে। জুলেখা সিরিঞ্জে ঔষধ ভরে নিয়ে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো জুলেখা। তার হাত থেকে খসে পড়লো ঔষধ সহ সিরিঞ্জটা। ভূতলে খান খান হয়ে ভেংগে গেলো।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে ফিরে তাকালো।

জুলেখা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে মেঝেতে। পায়ের কাছে টুকরো ভাংগা সিরিঞ্জের খন্ডগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। এক রাশ কালি কে যেন মেখে দিয়েছে জুলেখার মুখে।

বনহুর হাস্য—উজ্জ্বল মুখে এগিয়ে আসে কি হলো?

জুলেখা কোন কথা না বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জুলেখার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে।

মনিরার দৃষ্টিশক্তি নেই, সে কিছুই বুঝতে না পেরে বসে থাকে নিশ্চুপ।

বনহুর মনিরার পাশে এসে কাঁধে হাত রাখলো।

মনিরা স্বামীর হাতের উপর হাত রেখে বলে উঠে—কি হলো? আমি কিছু বুঝতে পারছিনা যে?

বনহুর মনিরার পাশে বসে পড়ে বললো—মনিরা একদিন আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করেছিলে, এবং সে জন্য জীবন নাশ করতেও গিয়েছিলে হরিদ্রা সাগর বক্ষে।

আজ কেনো আবার সে কথা তুলছো?

না বলে উপায় নেই মনিরা বলতেই হবে।

বলো?

তোমার বান্ধবী তোমার স্বামীকে ভালবেসে ফেলেছে মনিরা।

কি বললে। কি বললে তুমি?

অতো ধৈর্যহারা হলে আমি নাচার। যদি স্থির হয়ে শোন তবে আমি বলতে পারি।

বলো শুনবো আমি বলো? আর কোন কথা আমি বলবো না। মনিরা স্বামীর দক্ষিণ হাত চেপে ধরে মুঠায়।

বনহুর বলে চলে—তোমার বান্ধবী মঞ্জুর সাহেবকে ভালবেসে ফেলেছে এবং তাকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবার উপক্রম---

না না, আর আমি শুনতে চাইনা। নিয়ে চলো আমাকে। চাইনা আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে। চাইনা- --চাইনা---চাইনা--

মনিরা এজন্যই আমি তোমাকে এতোদিন বলিনি কোন কথা। ধৈর্য ধরে সব শুনে যাও তারপর যা ভাল মনে করো বলো।

কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্ত আমি থাকতে চাইনা।

তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে চাও না?

না চাই না। আমি চিরদিন অন্ধ হয়ে থাকবো তবুও---

মনিরা এতো অধৈর্য তুমি। আমি কি তাকে ভালবেসেছি? আমি কি তাকে চাই? কেনো কেনো তুমি বুঝোনা! মনিরা জীবনে বহু নারীর সান্নিধ্য লাভ আমার ঘটেছে কিন্তু কোন নারীর প্রেমাশ্রু আমাকে পথচ্যুত করতে সক্ষম হয়নি। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে, কোনদিন পথচ্যুত হইনি। মনিরা, জুলেখা জানোনা তুমি আমার স্ত্রী তাকে কথাটা না বলে ভুল হয়েছে। বললো হয়তো এতোটা হতে পারতোনা। একটু নিশ্চুপ থাকার পর বললো বনহুর—মনিরা সব খুলে বলবো আজ তোমার বান্ধবীর কাছে।

না না, তার চেয়ে চলো আমরা চলে যাই এখান থেকে। কাজ নেই আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এনে ---

বনহুর রাগতভাবে বললো—তুমি চুপ করে থাকো মনিরা যা করতে হয় বা বলতে হয় আমি জানি। আমি জুলেখার ভুল ভেংগে দিতে চাই।

বনহুর আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো কক্ষ হতে। প্রথমে চ্যাম্বারে প্রবেশ করে দেখলো—জুলেখা সেখানে নেই। লেবরেটরীতেও নেই। বিস্মিত হলো বনহুর—গেলো কোথায় সে তবে। বনহুর যখন জুলেখার অন্বেষণে এদিক —ওদিক তাকাচ্ছিলো ঠিক সেই সময় তার পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো একটা দারওয়ান।

বনহুর তাকে লক্ষ্য করে বললো —ডক্টর কাঁহা, দেঁখ্যা তুম?

হাঁ দেখ্যা বাবুসাহাব, ডক্টর আপামনি বাগানকা তরফ গিয়া।

বনহুর এবার বাগানের দিকে অগ্রসর হলো। জুলেখাদের বাড়ীর সম্মুখেই ছিলো বাগানটা। প্রায় এক বিঘা জমি নিয়ে মস্ত বাগান। নানা রকম ফুলের সমারোহ ছিলো এ বাগানে। জানা-অজানা কত রকম গাছ-গাছড়ায় ভর্তি। বাগানের দক্ষিণ দিকে মস্ত বড় পুকুর ছিলো একটা। পুকুর পাড়ে অনেকগুলি পাইন গাছ গোলাকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই সান বাঁধানো ঘাট। পুকুরের পানিতে ভাসছে পদ্মপাতা, মাঝে মাঝে দু'চারটা পদ্মফুলও ফুটে রয়েছে। সখ করে জুলেখার আব্বা পুকুরে পদ্মগাছ লাগিয়েছিলেন। আগে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটে থাকতো পুকুরের পানিতে। আজ যদিও সেরকম নেই, তবু দু'চারটা পদ্মফুল পুকুরের শোভা বর্দ্ধন করে থাকে এখনও।

এই পুকুরঘাটেই বসেছিলো জুলেখা, মুখোভাব গম্ভীর বিষণ্ন সব আশা-বাসনা যেন নিমিষে মুছে গেছে তার জীবন থেকে আজ পর্যন্ত তাকে বহু

পুরুষের সাথে মিশতে হয়েছে, কিন্তু কাউকেই সে ভালবাসতে পারেনি কোনদিন অন্তর দিয়ে। অনেকেই তার কাছে এসেছে, প্রেম নিবেদন জানিয়েছে—সবাইকে কেমন যেন স্বার্থপর মনে হয়েছে। কাউকে জুলেখা তেমন করে বিশ্বাস করতে পারেনি।

জুলেখা শিক্ষিতা—আদর্শবতী বিদুষী যুবতী। চরিত্রহীনা বা কু'মনোবৃত্তি মেয়ে সে নয়। যে কোন পুরুষকে সে ভালবাসতে পারবে না, বা পারেনি কোনদিন। কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে মঞ্জুর সাহেবের কাছে—পরাজিত হয়েছে সে। নিজের অজ্ঞাতে ভালবেসে ফেলেছে কখন তাকে।

মঞ্জুর সাহেবকে দেখার পর জুলেখা নিজ অন্তরে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করছে। সব সময় নানা কাজে লিপ্ত থেকেও বিস্মৃত হতে পারেনি এক দন্ডের জন্যও তাকে। হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে সর্বক্ষণ কামনা করে এসেছে মঞ্জুর সাহেবকে। অনেক সময় জুলেখা নিজেই ভেবে পায়নি, তার মনের এই অহেতুক ভাবান্তরের কারণ কি? সে সম্পূর্ণভাবে জানে, মঞ্জুর সাহেব আর মনিরার মধ্যে কোন সংযোগ রয়েছে। না হলে মঞ্জুর সাহেব মনিরার জন্য এতো করতোনা, পড়ে থাকতো না তাদের এখানে। এতো জেনেও জুলেখা কেনো নিজের মনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো মঞ্জুর সাহেবকে।

জুলেখার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুই ফোঁটা অশ্রু।

ঠিক সেই মুহূর্তে পিছনে এসে দাঁড়ায় বনহুর—মিস্ জুলেখাঁ!

জুলেখা চট করে হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে ফেলে, কোন জবাব দেয়না।

বনহুর পুনরায় ডাকে—মিস জুলেখা, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

জুলেখা এবার চোখ তুলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে তারপর বললো—বলুন?

বনহুর জুলেখার নিকট হতে একটু দূরে এসে পড়লো। তারপর বললো—মিস জুলেখা, প্রথমেই আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কারণ একটা ভুল হয়ে গেছে, যার জন্য আমি এবং মনিরা উভয়েই আপনার কাছে অপরাধী।

জুলেখা নতমুখে বসে রইলো আঁচল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো সে।

বনহুর বললো আবার—আপনি না জেনে হয়তো ভুল করে ছিলেন যার জন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। মনিরা আমার বিবাহিতা স্ত্রী.......

জুলেখা নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠলো, দু'চোখে রাশিকৃত বিস্ময় নিয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—মনিরা আপনার স্ত্রী!

হাঁ, মিস জুলেখা। কিন্তু লোকসমাজ জানে না একথা, সবাই জানে—মনিরা আজও অবিবাহিতা!

তার মামীমা, তার বাড়ীর সবাই?......

মামীমা আর সরকার সাহেব ছাড়া তাদের বাড়ীর কেউ জানে না।

জুলেখা বিস্ময়াবিষ্টের মত বসে রইলো চুপ করে, তার কণ্ঠ দিয়ে কোন কথা বের হলো না।

বনহুর জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললো আবার—মিস্ জুলেখা আমি দোষী। সত্য কথা না বলার জন্য চরম অপরাধী....একটু চুপ করে থেকে আবার বললো সে—আপনার অনুগ্রহ ছাড়া মনিরার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে না। মিস জুলেখা, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন......

মঞ্জুর সাহেব!

মিস জুলেখা......

আমি কথা দিলাম মনিরার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আনতে আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দেবো, তবুও চেষ্টা থেকে ক্ষান্ত হবো না।

মিস জুলেখা। বনহুরের কণ্ঠে ঝরে পড়ে রাশিকৃত কৃতজ্ঞতা।

বনহুর ও জুলেখার যখন বাগান বাড়ীতে পুকুর ঘাটে কথা হচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে নাজির শাহ। জুলেখার খোঁজে সে এ কক্ষে প্রবেশ করেছে। মনিরাকে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়ায় নাসির শাহ অবাক হয়ে যায় সে। মনিরাকে চিনতে ভুল হয় না।

এতোদিন ধরে মনিরা আর বনহুর জুলেখাদের বাড়ী রয়েছে কিন্তু নাসির শাহ তার সন্ধান জানে না। কারণ সে কোন দিন বাড়ীর খোঁজখবর রাখতো না। বাড়ী ফিরতো গভীর রাতে আবার বেরিয়ে যেতো খুব ভোরে সারাদিন ইন্ডাষ্ট্রি দেখাশুনার নাম করে কাটিয়ে দিতো তার গোপন আড্ডা ক্লাব আর জুয়াখেলায়। মদ না খেলে একদিনও তার চলতো না। গভীর রাতে মদের নেশায় টলতে টলতে বাড়ী ফিরতো। বাড়ী-ঘর-সংসার বলে তার কোন অনুভূতি ছিলো না। ক্লাব আর গুন্ডাদের নিয়েই কাটাতো সে সারাটাক্ষণ।

আজ হঠাৎ জুলেখার সন্ধানে এসে দেখতে পেলো মনিরাকে। নাসির শাহর চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠলো লালসায়। বিস্মিত হলো না সে, কারণ বুঝতে পারলো, জুলেখা আইজ স্পেশালিষ্ট তাই মনিরা এসেছে জুলেখার কাছে চক্ষুর চিকিৎসার জন্য।

নাসির শাহ্ জানে—মনিরা দৃষ্টিহীন, কজেই মনিরাকে এখন হাতের মুঠায় পেয়েছে। নাসির শাহ্ মনিরার দিকে অগ্রসর হলো।

এমন সময় বনহুর আর জুলেখা প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

পদ শব্দে ফিরে তাকালো নাসির শাহ!

জুলেখা আর একটি লোককে তার সঙ্গে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো মাঝপথে, একটু হেসে বললো নাসির শাহ—জুলেখা, তোমাকেই খুঁজছিলাম। তা ইনি কে?

বনহুরকে দেখিয়ে বললো নাসির শাহ্।

নাসির শাহকে মনিরার কক্ষে দেখেই জুলেখার মুখ গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠেছিলো, বললো সে—ইনি আমার বান্ধবী মনিরার স্বামী মিঃ মঞ্জুর সাহেব।

ক্ষণিকের জন্য নাসির শাহর মুখভাব গম্ভীর হয়ে পড়লো! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো সে বনহুরের মুখের দিকে।

জুলেখা বললো—মঞ্জুর সাহেব, এ আমার বড় ভাই নাসির শাহ্।

বনহুর নাসির শাহর দিকে দক্ষিণ হাতখানা এগিয়ে দিলো। হ্যান্ডসেক করার জন্য।

নাসির শাহ্ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতখানা বাড়ালো বনহুরের দিকে।

জুলেখা বললো—ভাইয়া, কি দরকার তোমার আমাকে?

এখন নয়, পরে বলবো। নাসির শাহ্ বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

তখনকার মত নাসির শাহ্ বেরিয়ে গেলেও মনিরার নেশা তাকে উম্মত্ত করে তুললো।

সোজা নাসির শাহ্ হাজির হলো গিয়ে তার গোপন আড্ডায়।

কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলো নাসির শাহের, যাদের দ্বারা সে তার মন্দ কাজগুলি সমাধা করতো।

নাসির শাহকে দেখেই তারা এগিয়ে এলো।

গোল টেবিলে গোলাকার হয়ে বসলো সবাই।

বয় মদের বোতল আর গেলাস এনে রেখে গেলো টেবিলে।

প্রতিদিন এ টেবিলে বসে নানা রকম কু'পরামর্শের অন্ত নেই তাদের। কোথায় কার সর্বনাশ করবে, সদা এই নিয়েই চলতো আলাপ আর আলোচনা। আজকের আলোচনার বিষয় হলো অন্ধ মনিরা।

নাসির শাহ্ তার প্রধান সহকারী রাজকে বললো—পেয়েছি, আর আমার হাতের মুঠো থেকে ফসকে যাবে না। কিন্তু ভেবেছিলাম মনিরাকে বিয়ে করবো......

রাজ দাঁত মুখ ভেংচে বললো—আরে ছোঃ একটা অন্ধ মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে নাসির?

তা হচ্ছে কই বন্ধু, মনিরা শুধু অন্ধই নয়—বিবাহিতা।

অবাক কণ্ঠে বললো রাজ—চৌধুরী মেয়ে মনিরা বিবাহিতা। অবাক করলে বন্ধু?

কেনো, এতে এমন অবাক হবার কি আছে রাজ?

আরে তুমি শুধু অর্থ আর নারীই বোঝ, আর আমরা সবদিকে তাল দিয়ে চলি। দুনিয়ার কোথায় কি ঘটছে সব আমাদের নখদর্পণে।

তাতো বুঝলাম, কিন্তু মনিরার বিয়ে হয়নি, তবে জুলেখা মিথ্যা কথা বলেছে। ঠিক, আমাকে সে ধোকা দিয়ে একটা ভেঁড়া বুঝ বুঝিয়েছে......

যেমন তুমি ভাই, তেমনি তোমার বোন। শোন নাসির, চৌধুরী মেয়ে মনিরাকে ভালবাসে দস্যু বনহুর....শুধু ভালবাসা-বাসি নয়, একেবারে গভীর প্রেম যাকে বলে। কাজেই এমন মেয়ের বিয়ে......নাঃ আমার কেমন সন্দেহ লাগছে।

দস্যু বনহুর মনিরাকে ভালবাসে এ কথা আমিও জানি। তাই বলে শহরে মনিরার সঙ্গে মাখামাখি করবে এমন সাহস তার হবেনা।

দস্যু বনহুরকে তুমি চেনোনা বাছাধন, দেখলে তো কেমন করে শত শত পুলিশ বাহিনীর চোখে দুলো দিয়ে হাওয়ায় উড়ে গেলো। যার জন্য তুমি বেচারাও নাজেহাল পেরেশান কম হলেনা। পুলিশের হাওলা হয়ে হাঙ্গেরী কারাগারটাও দেখে এলে।

এটা আমার কপাল জোর বন্ধ। কারণ কান্দাই-এ বহু লোকই আছে কিন্তু এমন সৌভাগ্য ক'জনার—ভাগ্যে জোটে বলো, দস্যু বনহুর সেজে পুলিশকেও ঘাবড়ে তুলেছিলাম।

হেসে উঠে বলে রাজ—আর একটু হলে হয়েছিলো আর কি।

দস্যু বনহুর ভেবে তোমাকেই ত্রিফলায় বিদ্ধ করে.....বাস্ বুঝেছোই।

নাসির শাহকে অতো বোকা পাওনি রাজ। ত্রিফলায় বিদ্ধ হবার পূর্বে আমিও গলায় ফাঁস লাগিয়ে পগার পার হতাম।

খাসা বুদ্ধি হে নাসির তোমার, খাসা বুদ্ধি। বনহুর বেটা এতো নাজেহাল পেরেশান হবার চেয়ে, বাপু তোমার বুদ্ধিটা বেছে নিলেই পারে।

হাঁ, তাহলেই লেঠা চুকে যায়, কি বলো.....

ঠিক সেই মুহূর্তে সম্মুখস্থ টেবিলে একখানা ছোরা এসে খচ্ করে গেঁথে গেলো।

বিস্ময়ে চমকে উঠলো নাসির শাহ ও রাজ, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষস্থ অন্যান্য সবাই উঠে দাঁড়ালো আতঙ্কগ্রস্তভাবে।

নাসির শাহ্ ছোরাখানা হাতে তুলে নিতেই দেখতে পেলো—এক খন্ড কাগজ ছোরায় গাঁথা রয়েছে।

নাসির শাহ ছোরা থেকে কাগজখানা খুলে নিয়ে চোখের সম্মুখে মেলে ধরেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো—দস্যু বনহুর।

গোল টেবিলের চার পাশে যারা এখনও বসেছিলো, সবাই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—কি বললে, দস্যু বনহুর!

সকলের মুখের কথা মুখেই রইলো। জমকালো একটা মূর্তি তাদের পিছনে এসে দাঁড়ালো, দুই হস্তে রিভলভার।

নাসির শাহ হাত থেকে কাগজের টুকরাটা খসে পড়লো। কক্ষস্থ সকলেই মুখমন্ডল ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কারো মুখে কোন কথা সরলো না।

নাসির শাহর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠলো। থর থর করে কাঁপছে, চোখে-মুখে অসহায়ের চাহনী। রাজ একটু সাহসী ধরণের লোক, এক নম্বরের গুন্ডা বলা চলে। রাজ চট্ করে ছোরাখানা টেবিল থেকে হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়ালো।

ছায়ামূর্তি অন্য কেহ নয় স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বৈকালে জুলেখার সঙ্গে বনহুর যখন মনিরার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো, তখন মনিরার কক্ষে প্রথম নাসির শাহকে দেখেই বনহুর তার মনোভাব অনুমেয় করে নিয়েছিলো। সুচতুর বনহুরের কাছে নাসির শাহর কুৎসিৎ মনোবৃত্তি গোপন ছিলো না, যদিও সে নিজেকে সংযত করে নিতে যথাসাধ্য চেষ্ট করেছিলো।

নাসির শাহ যেন তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারলে বেঁচে যায়, এমনি ভাবেই সরে পড়েছিলো।

বনহুর জুলেখার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বললেও তার মনের মধ্যে তখন নাসির শাহই উঁকিঝুঁকি মারছিলো। বনহুর বেশীক্ষণ জুলেখার সঙ্গে মনিরার কক্ষে ছিলো না, বেরিয়ে এসে আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলো নাসির শাহকে।

রাজ টেবিল থেকে ছোরাখানা হাতে তুলে নিতেই বনহুর বুটের এক লাথি দিয়ে তার হাত থেকে ছোরাখানা ছিটকে ফেলে দিলো দূরে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো সে—নাসির শাহ, যে মতলব নিয়ে বুদ্ধির প্যাচ খেলছো—তা থেকে ক্ষান্ত থাকবে নচেৎ তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

কথা শেষ করার পূর্বেই বনহুর রিভলভার চেপে ধরেছিলো নাসির শাহের বুকে, এবার নাসির শাহর পকেট থেকে দশ হাজার টাকার নোটের

একটা ফাইল বাম হস্তে তুলে নিলো। ইতিমধ্যে বনহুর তার বামহস্তের রিভলভারখানা প্যান্টের পকেটে রেখেছিলো।

এক ঘর লোক থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলো, কেউ একটু টু-শব্দ করতে পারলো না।

বনহুর যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ করো মুখে কারো কথা নেই, সবাই যেন একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো।

পরক্ষণেই হুস হলো রাজের, দাঁতে দাঁত পিষে বললো—ফোন, ফোন করো নাসির......পুলিশ অফিসে ফোন করো—দস্যু বনহুর এসেছিলো এখানে।

নাসির শাহর মুখ মরার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। শুধু মৃত্যু ভয়ই দস্যু বনহুর তাকে দেখিয়ে গেলো না, নিয়ে গেছে তার দশ হাজার টাকা।

রাজের কথায় হুশ হলো নাসির শাহর, হাঁউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো নাসির শাহ—রাজ, পুলিশ অফিসে ফোন করে আর কি হবে। দস্যু বনহুর কি আর দশ হাজার টাকা ফেরৎ দেবে?

তবু পুলিশকে ব্যাপারটা জানানো ভালো।

যা খুশী তোমরা করো, যেখানে খুশী ফোন করো....মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো নাসির শাহ একটা চেয়ারে।

কক্ষমধ্যে একটা ভয়াবহ থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগলো। যে দস্যু বনহুরের নামে সমস্ত দেশবাসী সদা আতঙ্কগ্রস্ত রয়েছে, যে দস্যুর ভয়ে লোকজন সচ্ছভাবে পথ চলতে পারে না, সেই দস্যু বনহুরের আবির্ভাব ঘটেছিলো এই গোপন আড্ডায়—কম কথা নয়।

নাসির শাহ আর বিলম্ব না করে বাড়ীর পথে রওয়ানা দিলো। রাজ ও অন্যান্য সবাই শত চেষ্ট করেও রুখতে পারলো না তাকে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত গাড়ী নিয়ে চললো নাসির শাহ। শুধু দশ হাজার টাকাই তার খোয়া যায় নি, মনিরার উপর হস্তক্ষেপ করা তার চলবে না, তা হলে মৃত্যু অনিবার্য।

বাড়ী ফিরে হন্ত-দন্ত হয়ে জুলেখার লেবরেটরী কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো—জুলেখা।

জুলেখা তখন মনিরার কক্ষে মনিরার চোখে ঔষধ লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিচ্ছিলো। পাশে বসে বসে বনহুর তাকে সহায়তা করছে।

এই কক্ষে এবার প্রবেশ করলো নাসির শাহ, বিক্ষিপ্তভাবে চুলগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে কপালে। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে একরাশ ভয় আর আতঙ্ক। কম্পিত কণ্ঠে ডাকলো নাসির শাহ—জুলেখা।

বড় ভাইয়ের কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালো জুলেখা এবং বনহুর।

মনিরার চোখে পট্টি বাঁধা তখন হয়ে গিয়েছিলো।

নাসির শাহর বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখোভাব লক্ষ্য করে জুলেখা বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠে—ভাইয়া, কি হয়েছে তোমার?

নাসির শাহ ঢোক গিলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠে—জুলেখা, সর্বনাশ হয়ে গেছে—ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ে নাসির শাহ।

বনহুর এবার বলে উঠে—সর্বনাশ? কি হয়েছে নাসির সাহেব?

জুলেখা ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো—ভাইয়া কি হয়েছে বলো?

নাসির শাহ বললো এবার—দস্যু বনহুর আমার.....

জুলেখা শুষ্ক ভয়-কম্পিত কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুর!

বনহুরও চোখে-মুখে ভীত ভাব টেনে এনে বললো—দস্যু বনহুর আপনার.....

হাঁ, আমার উপর হামলা চালিয়ে দশ হাজার টাকা সে নিয়ে গেছে।

বিস্ময়ে বনহুরের মুখমন্ডল হা হয়ে উঠে, বলে—দশ হাজার টাকা।

জুলেখা বলে—তবু ভালো টাকা নিয়েই সে ক্ষান্ত হয়েছে ভাইয়া। ভাগ্যিস তোমাকে হত্যা করেনি.....

হত্যা করেনি কিন্তু হত্যার হুমকি দেখাতে সে কসুর করেনি। জুলেখা, কোন্ মুহূর্তে দস্যু বনহুর আমাকে হত্যা করে বসে তার ঠিক নেই।

জুলেখা বললো—দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই ভাইয়া। সমস্ত কান্দাই শহর যার নামে আতঙ্কগ্রস্ত। পুলিশ বাহিনীকে যে দস্যু নাকানি-চুবানী খাইয়ে ছাড়ছে, তার কথা সত্যি ভয়ানক।

দস্যু বনহুর মনে মনে হাসলো।

মনিরা চোখে না দেখলেও ওদের সব কথা সে শুনতে পাচ্ছো। বুঝতে পারলো সব কিছু।

ভাই-বোনের ভীতিপূর্ণ আলোচনায় যোগ দিলো বনহুর।

একটু পূর্বে সে নাসির শাহর পকেট থেকে দশ হাজার টাকার নোটের ফাইল আত্নসাৎ করে নিয়েছে, এখনও তার পকেটে সেই টাকা বিরাজমান।

বনহুর বললো নাসির শাহ, আপনি সাবধানে থাকবেন। দস্যু বনহুর নাকি অপরাধীকে কিছুতেই ক্ষমা করে না।

নাসির শাহ আবার ঢোক গিলোলো, কোন কথা বের হলো না তার কণ্ঠ দিয়ে।

বনহুর এবার মনিরা সহ ফিরে এল চৌধুরী বাড়ীতে। জুলেখা মনিরার চোখে একটা ঔষধ লাগিয়ে পট্টি করে দিয়েছে। এক সপ্তাহ পর আবার মনিরাকে আসতে হবে জুলেখার বাড়ীতে। সেদিন মনিরার চোখের বাঁধন মুক্ত করে দেওয়া হবে। মনিরার দৃষ্টিশক্তির ভাগ্য নির্ভর করছে সেই দিনটির উপর।

ফিরে এলো মনিরা নিজ বাড়ীতে, সঙ্গে দস্যু বনহুর।

বনহুর নিজে মটর ড্রাইভ করছিলো।

পথের ধারে পুলিশগণ পাহারায় রত হয়েছে। বনহুর নির্বিঘ্নে তাদের সম্মুখ দিয়ে গাড়ী নিয়ে এগিয়ে এলো।

মনিরাকে নিয়ে বনহুর যখন চৌধুরী বাড়ী পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

মরিয়ম বেগম পুত্র এবং মনিরাকে পেয়ে খুশীতে মেতে উঠলেন। আবার একটা আনন্দের উৎস বয়ে চললো মরিয়ম বেগমের মনে।

মনিরা আর মায়ের কাছে নিবিড় হয়ে বসলো বনহুর আজ। পাশে মা, অদূরে অন্ধ মনিরা।

বললো বনহুর—আমি এক সপ্তাহ পর আবার আসবো মা, আজকের জন্য বিদায় দাও।

মনির, এখনও কি তুই দস্যুতা ত্যাগ করতে পারলিনা? কিসের অভাব তোর—ধন-মাল-ঐশ্বর্য সব তোর রয়েছে। বাবা, কি জন্য তুই এখনও দস্যুতা করছিস বল্ আমাকে।

মা, তুমি কি মনে করো আমি ধন-মাল আর ঐশ্বর্যের লোভে দস্যুতা করি?

তবে কিসের জন্য বল মনির?

এ কথা তোমাকে অনেক বার বলেছি মা। তোমার পুত্র কোনদিনই কু'মতলব নিয়ে দস্যুতা করেনা। পরের মঙ্গল চিন্তাই তার একমাত্র পাথেয়। মা গো, তুমি আমাকে কোন সময় ভুল বুঝনা।

বাবা, চিরদিন কি এমনি করে কাটবে বল্? আমার দিকে না তাকিয়ে কিন্তু মনিরা....ওর জন্যও তো তোকে ভাবতে হয়। তোর জন্য একটি জীবন এমনি করে নষ্ট হয়ে যাবে মনির।

বনহুর ধীরে ধীরে ভাবাপন্ন হয়ে যায়। মায়ের শেষ কথাটার প্রতিধ্বনি হয় কানে.....তোর জন্য একটি জীবন নষ্ট হয়ে যাবে মনির.....তোর জন্য একটি জীবন নষ্ট হয়ে যাবে মনির.....

বনহুর দুই হাতে মাথার দুই পাশে টিপে ধরে। মায়ের কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। মায়ের কণ্ঠের সঙ্গে আরও শত শত কণ্ঠ যেন প্রতিধ্বনি করে

উঠে....একটি নয়, এমন অনেক জীবন তুমি নষ্ট করে দিয়েছো বনহুর.....একটি নয়, অনেক জীবন নষ্ট করে দিয়েছো বনহুর....ব্যর্থ করে দিয়েছো। যে নারী তোমাকে দেখেছে সেই তোমাকে ভালবেসেছে.....চোখের জল ফেলেছে, মন-প্রাণ সঁপে দিতে চেয়েছে তোমাকে....কিন্তু তুমি কাউকেই ধরা দাওনি....তোমার নীরব কঠিন হৃদয়ের সাড়া কেউ পায়নি....পাষাণ মূর্তির মতই তুমি অচল অটল রয়েছো...কোন নারীর অশ্রুই তোমাকে বিচলিত—পথ ভ্রষ্ট করতে পারেনি....চিরদিন তারা অশ্রু বিসর্জন করেছে তোমার জন্য.....না না, একটি নয়, বহু নারীর জীবন তুমি নষ্ট করে দিয়েছো বনহুর.....শুভাষিণী, হীরাবাঈ আতিয়া, সিন্ধিরাণী, এমনি আরও কত যুবতীর জীবনই না তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছো, ব্যর্থ করে দিচ্ছো নূরীর জীবন বনহুর তুমি অপরাধী—তুমি দোষী....তোমার জন্য জোবাইদা হারালো তার ফুলের মত একটি সুন্দর জীবন....জোবাইদার মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী বনহুর....

বনহুর অধর দংশন করে, কিছুতেই নিজকে সে সংযত রাখতে পারেনা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে—মা, আমি দোষী....আমিই দোষী-অপরাধী..মা, আমাকে কেউ ক্ষমা করবেনা—কেউ ক্ষমা করবেনা।

মনিরা দেখতে না পেলেও স্বামীর মনের ব্যাকুলতা বুঝতে পারলো, চঞ্চল হয়ে পড়লো সে। বললো মনিরা—মামীমা, কে বললো আমার জীবন ও নষ্ট করে দিচ্ছে? কেনো তুমি ওকে এ কথা বলে কষ্ট দিচ্ছো? আমার মত সৌভাগ্যবতী আর কে আছে বলো?

বনহুর বললো আবার—মনিরা, মিছামিছি নিজকে সৌভাগ্যবতী বলে আমাকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করো না। মায়ের কথা অত্যন্ত সত্য আমি তোমার জীবন ব্যর্থ করে দিচ্ছি।

মরিয়ম বেগম বললেন এবার—হাঁ, যতদিন তুই আমার মনে আঘাত দিবি ততদিন আমি তোকে ক্ষমা করবো না।

মা! অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো বনহুর।

মরিয়ম বেগম কঠিন কণ্ঠে বললেন—মনিরার সুখে আমার সুখ, মনিরার শান্তিতে আমার শান্তি, যতদিন মনিরা মা আমার চোখের পানি ফেলবে, ততদিন আমি।

মনিরা উঠে পড়তে গিয়ে এগিয়ে এলো, চেপে ধরলো মামীমার মুখ—ওকে তুমি অভিশাপ দিওনা মামীমা, ওকে তুমি অভিশাপ দিওনা।

এমন সময় সরকার সাহেব দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন বেগম সাহেবা!

মরিয়ম বেগম উঠে দাঁড়ালেন—আসছি।

বেরিয়ে গেলেন মরিয়ম বেগম।

বনহুর ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মনিরা বুঝতে পারলো, মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবের ডাকে বেরিয়ে গেছেন। স্বামী বসে আছে তার অনতিদূরে তাই মনে করে মনিরা বললো—তুমি মামীমার কথায় রাগ করলে? লক্ষীটি রাগ করোনা, মামীমা যাই বলুন আমার-তোমার মঙ্গলের জন্যই বলেন, বুঝলে? ওকি কথা বলছো না কেনো? আমার উপর বুঝি রাগ করছো? ছিঃ ছেলেমানুষী করতে নেই। এসো, আমার কাছে এসো।

মনিরা স্বামীর অন্বেষণে দুই হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে।

সরকার সাহেবের সঙ্গে কথা শেষ করে ফিরে আসেন মরিয়ম বেগম। হাতে তার খাবারের প্লেট।

দরজার পাশে এসে থমকে দাঁড়ান, তার কানে ভেসে আসে মনিরার হাসির শব্দ—দুষ্ট, আমি তোমাকে দেখতে পাইনা বলে খুব ভোগানো হচ্ছে। দাঁড়াও মামীমাকে ডাকছি—মামীমা....মামীমা....

এই যে মা আমি আসছি। মরিয়ম বেগম হাসতে হাসতে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কক্ষে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালেন—কোথায় মনির। শুন্য কক্ষ খাঁ খাঁ করছে। চারিদিকে ব্যাকুল আঁখি মেলে দেখতে লাগলেন।

মনিরার মুখে তখনও আনন্দের হাসি লেগে রয়েছে, মামীমার আগমণে একটু লজ্জাও বোধ করছে সে, তবু বললো—মামীমা দেখো না আমি দেখতে পাইনা বলে আমার সঙ্গে কথাও বলেনা।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগম—কে কথা বলবে তোর সঙ্গে? কে কথা বলবে মা?

ও.....

হায়রে হতভাগী, কার সঙ্গে তুই এতোক্ষণ কথা বলছিলি! সেকি আছে? কখন চলে গেছে কে জানে......

চলে গেছে! ও চলে গেছে মামীমা?

হাঁ, মরিয়ম বেগম পুত্রের জন্য খাবার এনেছিলেন হাতে করে, ধীরে ধীরে টেবিলে খাবারের প্লেট নামিয়ে রেখে বসে পড়লেন, খাটের পাশে।

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর—জোবাইদার প্রেত আত্মা!

হাঁ সর্দার, রোজ রাতেই প্রেত আত্মা গোটা আস্তানায় ঘুরে বেড়ায়। ছায়ার মতই দেখে যায় তাকে, গুলী ছুঁড়লে হাওয়ায় মিশে যায়। নিকটে গেলে দেখা যায় না।

কথাগুলো বললো রহমান।

বনহুরের চোখেমুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো।

দরবার কক্ষস্থ সকলেই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো।

বনহুর সকলের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—দরবার কক্ষে সবাই উপস্থিত আছে?

হাঁ সর্দার, সকলেই উপস্থিত আছে। বললো রহমান।

বনহুর গভীর কণ্ঠে বললো—জোবাইদার হত্যাকারীর সন্ধান পেয়েছো রহমান?

না সর্দার, এখনও জোবাইদার হত্যাকারীর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

আস্তানায় আমরা অনুচরদের মধ্যে কেউ কি বাইরে গেছে?

না, আপনার আদেশ অমান্য করার সাহস কারো নেই। আস্তানার বাইরে কেউ যায়নি সর্দার।

বেশ।

সেদিনের মত দরবার শেষ হলো।

গভীর রাত।

সমস্ত আস্তানা জুড়ে বিরাজ করছে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা।

প্রহরীদের ভারী বুটের শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই।

আজ ক'দিন হলো জোবাইদার প্রেত আত্মার আবির্ভাবে বনহুরের সাহসী দুর্ধর্ষ অনুচরগণও ভড়কে গেছে। গোটারাত ধরে তারা জেগে হই-হুল্লোড় করতো, কিন্তু এখন আর তাও করেনা। সদা ভয় কখন জোবাইদার প্রেত আত্মা তাদের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে নেবে।

এতোবড় একটা আস্তানায় সদা সর্বদা একটা আতঙ্ক ভাব জেগে রয়েছে।

বনহুর নিজের কক্ষে রিভলভার হস্তে পায়চারী করছে। জোবাইদার প্রেত আত্মাকে আজ সে দেখবে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে—যদি আপোষে না হয় তবে রিভলভারের গুলীতে হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, রহমানের কণ্ঠস্বর শুনতে যায় বনহুর।

দরজার বাইরে ফিস ফিস করে ডাকছে রহমান—সর্দার, সর্দার।

বনহুর রিভলভার হস্তে দরজার বাইরে বেরিয়ে এলো।

রহমানের মত সাহসী যুবকের মুখেও ভয়ার্ত ভাব বনহুরকে দেখে বললো সে সর্দার, সেই ছায়ামূর্তি। জোবাইদার প্রেত আত্মা।

কোথায়? বললো বনহুর।

সর্দার, ঐ যে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রহমান আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেলো সম্মুখের দিকে।

বনহুর দেখলো—একটা জমকালো ছায়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

রহমান সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উঁচু করে ধরলো।

বনহুর বাম হস্তে রহমানের রাইফেল নীচু করে দিলো, মুখে কোন কথা বললোনা।

কিন্তু ততক্ষণে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়েছে।

রহমান বললো—সর্দার, দেখলেন কেমন হাওয়ায় মিশে গেলো।

বনহুর বললো—রহমান, জোবাইদার প্রেত আত্মাকে যেন গুলী করো না।

করেছিলাম সর্দার কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।

আশ্চর্য। বনহুর কথাটা উচ্চারণ করলো।

ফিরে এলো বনহুর আর রহমান নিজেদের কক্ষে।

রহমান বললো—সর্দার, এবার তো বিশ্বাস করেছেন জোবাইদার আত্মা কিনা?

বনহুর পায়চারী করতে করতে বললো—জোবাইদার প্রেত আত্মা কি চায় রহমান বলতে পারো?

না সর্দার, এ কথা আমরা বলবো কি করে?

রহমান।

বলুন সর্দার?

নূরীকে আজ দেখিনি কেনো?

কি জানি, জোবাইদার মৃত্যুর পর নূরী কেমন যেন হয়ে গেছে, এক সঙ্গেই থাকতো কিনা, তাই বোধ হয় শোক পেয়েছে বেচারী।

মিথ্যা নয় রহমান, এটা স্বাভাবিক। নূরী কি ঘুমিয়েছে?

হাঁ সর্দার, এখন তার কক্ষ অন্ধকার দেখছি, হয়তো ঘুমেয়ে পড়েছে।

তুমি যাও রহমান, নূরী যদি ঘুমিয়ে না থাকে তবে কথা শেষ না করে থেমে পড়লো বনহুর, একটু চিন্তা করে বললো—আচ্ছা আমিই যাচ্ছি ওর ওখানে।

বনহুর রিভলভার টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

রহমান চলে গেলো রাইফেল হস্তে বিপরীত দিকে।

বনহুর নূরীর কক্ষে প্রবেশ করেই সুইচ টিপে আলো জ্বালালো।

বনহুরের আস্তানায় ভূগর্ভ জলস্রোত হতে কারেন্ট তৈরী হতো এবং সেই কারেন্ট থেকে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলতো। কিন্তু মশালও ব্যবহার করতো বনহুর তার নিজস্ব কক্ষে এবং দরবার কক্ষে।

বনহুর আলো জ্বালতেই দেখতে পেলো—নূরী মনিকে বুকের কাছে নিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

বনহুর কিছুক্ষণ নূরীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে চাদরখানা মনি আর নূরীর গায়ে টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো লঘু পদক্ষেপে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদিকের জানালা হতে সরে গেলো একটি মুখ।

বনহুর ফিরে এলো নিজের কক্ষে।

বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই নজরে পড়লো দরজার পাশে একটা ছোরা গাঁথা, ছোরায় একখানা কাগজ ভাঁজ করা আছে মনে হচ্ছে।

বনহুর অবাক হলো, শয্যা ত্যাগ করে উঠে এলো দরজার পাশে। সত্যিই একখানা ছোরা গাঁথা রয়েছে দরজার চৌকাঠে।

বনহুর ছোরাখানা তুলে নিলো হাতে—অপরিচিত ছোরা। এ ছোরা তার আস্তানায় তৈরী হয়নি। কারণ, বনহুরের আস্তানায় তৈরী ছোরার বাটে একটি সংকেত চিহ্ন আঁকা থাকে। আশ্চর্য হলো বনহুর, তার আস্তানায় অজ্ঞাত ছোরা—দস্যুর উপর দস্যুতা।

বনহুর ছোরা থেকে কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো তার কক্ষস্থ মশালের আলোর সামনে। কাগজে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে। হাসি থামিয়ে ছোরাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলো খাটের নীচে, আর কাগজের টুকরা খানা ভাঁজ করে রেখে দিলো জামার পকেটে।

❑

পরদিন।

বন্দিনী নাসরিনের বিচার দিন।

দরবার কক্ষে বনহুরের সমস্ত অনুচর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই হস্তে রাইফেল-বর্শা-বল্লম।

বনহুরের আসনের পাশে উপবিষ্টা বৃদ্ধা দাইমা আর নূরী।

মনি ঠিক নূরীর কোলের কাছে দাঁড়িয়ে।

নাসরিনের হাত দু'খানা লৌহ শিকলে বাঁধা, বনহুরের সম্মুখে ভূতলে নত মুখে বসে আছে। চুলগুলো পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। মুখমন্ডল করুণ অশ্রুসিক্ত।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—নাসরিন, তুমি মৃত্যু চাও না মুক্তি চাও?

নাসরিন চোখ তুলে তাকালো, ঠোঁট দু'খানা নড়ে উঠলো, কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারলো না।

বনহুর পুনরায় কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠলো—নাসরিন, আমার নিকটে কোন সময় মিথ্যা বলতে বা কিছু গোপন করতে চেষ্টা করোনা, আমি জানি—জোবাইদার হত্যাকারী তুমি, কাজেই মৃত্যু চাও না মুক্তি চাও?

নাসরিন মুহূর্তে চোখ তুলে তাকালো, নূরীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার।

নূরী অধর দংশন করলো।

বনহুর বললো—কি চাও তুমি? মৃত্যু হলে জোবাইদার হত্যার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করতে হবে, আর যদি মুক্তি চাও তবে তোমার হস্তদ্বয় ছেদন পূর্বক তোমাকে আমরা আস্তানা থেকে বের করে দেওয়া হবে। বলো কোন্‌টা চাও?

নাসরিন এবার মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলো—মৃত্যুই আমি চাই।

বেশ, তাই হবে। রহমান, কাল ভোর রাতে নাসরিনকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে।

রহমান বলে উঠলো—সর্দার।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমার আদেশ অমান্য হবার নয়। যাও, কালকের জন্য প্রস্তুত হও।

বনহুর কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো।

সমস্ত দস্যু অনুচরের মুখমন্ডল বিবর্ণ করুণ হলো। তারা সবাই জানে—নাসরিন অতি ভাল মেয়ে। সে কিছুতেই জোবাইদাকে হত্যা করতে পারে না। কিন্তু সর্দারের আদেশ—নাসরিনের মৃত্যুদন্ড হবেই।

সমস্ত আস্তানায় একটা গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো। সবাই নাসরিনের মৃত্যুদন্ড নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো—এমন কি রহমানের মনেও একটা ব্যাথার ছায়া ঘনিয়ে এলো।

সর্দারের বিচারে কেউ খুশী হতে পারলো না তেমন করে।

নাসরিনকে আবার সেই অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী করে রাখা হলো। রাত ভোরে তাকে হত্যা করা হবে। জোবাইদাকে হত্যার অপরাধে তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে—

সর্দারের এ বিচারে কেউ খুশী না হলেও প্রতিবাদ করতেও সাহসী হয়নি কেউ।

গোপনে তারা দু'চারটে আলাপ আলোচনা যে না করলো তা নয়। সবাই দুঃখ করলো, অনুতপ্ত হলো, ব্যথিত হলো—নীরবে কেউ কেউ চোখের পানি মুছলো।

বনহুর আজ সকাল সকাল চারটি খেয়ে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলো। শরীর নাকি তার ভাল নয় আজ।

রহমান বুঝতে পারলো, নাসরিনের মৃত্যু দন্ডাদেশ দিয়ে সর্দার খুব ব্যাথা পেয়েছে, কিন্তু কি করবে, আইন তো অমান্য করতে পারে না সে।

এক প্রহর দু'প্রহর করে রাত বেড়ে চললো।

রহমান সর্দারকে বিরক্ত না করে আস্তানায় ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগলো। এটা তার ডিউটি—তার কাজ।

সমস্ত আস্তানা ঝিমিয়ে পড়েছে।

রহমান ঘুরে বেড়াচ্ছে, সজাগ প্রহরীর মত।

হঠাৎ চমকে উঠে রহমান অদূরে একটা, জমকালো ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিনের মত। রাইফেল উদ্যত করতেই কানের কাছে ভেসে

উঠলো সর্দারের কণ্ঠস্বর—ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করে কখনও গুলী ছুঁড়বে না। রহমান উদ্যত রাইফেল নামিয়ে নিলো।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলেছে।

রহমান আজ গুলী না ছুঁড়ে অনুসরণ করলো ছায়ামূর্তিটিকে। অতি সন্তর্পণে সাবধানে এগুতে লাগলো সে। থামের আড়ালে, দেয়ালের আড়ালে গোপনে গা ঢাকা দিয়ে ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করলো রহমান।

রহমান যখন ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে, ঠিক্ তখন বিপরীত দিক থেকে অন্ধকারে আত্মগোপন করে উদ্যত রিভলভার হস্তে অগ্রসর হচ্ছিলো বনহুর। উভয়েরই লক্ষ্য সেই জমকালো ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তি অতি লঘু পদক্ষেপে এগুচ্ছে।

কোথায় চলেছে আজ দেখবে রহমান।

বনহুর জানতে চায় জোবাইদার প্রেত আত্মা কেমন, কি তার অভিসন্ধি। মানুষ না সে অস্পৃশ্য ছায়া।

দু'জনার লক্ষ্য একই বস্তু।

দু'জনার মনেই একই জানার বাসনা।

অন্ধকারে এগুচ্ছে জমকালো ছায়ামূর্তি।

রহমান এগুচ্ছে, বিপরীত দিক থেকে এগুচ্ছে বনহুর।

হঠাৎ বনহুরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায় রহমানের।

বনহুর ঠোঁটে আংগুল চাপা দেয়।

রহমান চাপা কণ্ঠে বলে উঠে—সর্দার, ওটা জোবাইদার প্রেত আত্মা।

পরবর্তী বই

প্রেত আত্মা

প্রেত আত্মা-২০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

জমাট অন্ধকারে সন্তর্পণে এগুচ্ছে ছায়ামূর্তি।

বনহুর আর রহমান অতি গোপনে অনুসরণ করছে ছায়া মূর্তিটিকে। বনহুরের হস্তে গুলী ভরা রিভালভার। আর রহমানের হস্তে উদ্যত রাইফেল। নিশ্বাস বন্ধ করে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

বনহুর ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে রিভলভারের এক গুলীতে ছায়ামূর্তির ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে কিন্তু তার সে ইচ্ছা নয়। বনহুর ছায়ামূর্তিটিকে গ্রেপ্তার করে দেখবে—কে সে, সত্যই জোবাইদার প্রেত আত্মা না অন্য কেউ।

বনহুরের আস্তানায় প্রেত আত্মা—কম কথা নয়!

ছায়ামূর্তিটা যতই অগ্রসর হচ্ছে—বনহুর আর রহমান ততই আত্মগোপন করে দ্রুত তাকে অনুসরণ করছে।

হঠাৎ বনহুর আর রহমান স্তম্ভিত হয়ে পড়লো—সম্মুখস্থ ছায়ামূর্তি আচম্‌কা কোথায় যেন মিশে গেলো।

রহমান রাইফেল্‌ বাগিয়ে ধরলো, এই মুহূর্তে সে গুলী ছুড়বে।

বনহুর দক্ষিণ হস্তে রহমানের রাইফেল নামিয়ে দিয়ে বললো—আর গুলী ছুড়ে কোন ফল হবে না রহমান।

তাহলে ও পালিয়ে গেলো?

সুযোগ দিলাম আজ ওকে।

সর্দার।

হাঁ রহমান।

কিন্তু ওটা জোবাইদার প্রেত আত্মা ছাড়া কিছু নয় সর্দার।

বনহুর হঠাৎ হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে।

রহমান অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

বনহুর ফিরে দাঁড়ালো—চলো রহমান।

অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো রহমান—সেকি সর্দার, ওখানে গিয়ে দেখলেন না একটি বার?

বৃথা অন্বেষণ করা হবে, ওখানে ওর চিহ্নটিও নেই।

বনহুর তার বিশ্রাম—কক্ষের দিকে অগ্রসর হলো।

রহমান অনুসরণ করলো তাকে।

কক্ষে প্রবেশ করে রিভলভারটা টেবিলে রেখে শয্যায় এসে বসলো বনহুর, মুখোভাব স্বাভাবিক।

রহমান সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চুপ, সর্দারের কোন আদেশের প্রতিক্ষা করছে সে।

বনহুর বললো—রহমান।

বলুন সর্দার?

তোমার কি সন্দেহ হয়—ঐ ছায়ামূর্তি জোবাইদার প্রেতআত্মা?

হয়না, কিন্তু আশ্চর্য —ঐ ছায়ামূর্তি ছায়াই বটে। সর্দার আমি অনেক দিন লক্ষ্য করেছি—নিশিথ রাতে যখন সমস্ত আস্তানা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে তখন কে যেন অতি সন্তর্পণে আস্তানার পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়, কার যেন লঘু পদশব্দ শোনা যায় গভীর অন্ধকার। একটা দীর্ঘশ্বাস যেন ভেসে বেড়ায় এদিক থেকে সেদিকে। কোন বেদনা ভরা নিঃশ্বাস।

বনহুর এবার আরো জোরে হেসো উঠলো—রহমান ভুলে যেওনা—তুমি সাধারণ মানুষ নও। তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে—আজকাল তুমি কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছো।

সর্দার, আপনি যা—ই বলুন, আমি নিজের চোখে দেখছি, সেই ছায়ামূর্তি কোথা থেকে আসে জানিনা, কিন্তু তাকে আমি জোবাইদার কবরের দিকে চলে যেতে দেখেছি।

তুমি আর ওকে অনুসরণ করোনা রহমান।

কেনো সর্দার।

ভয় পাবে।

সর্দার রহমান ভয় পাবার বান্দা নয়।

জানি, কিন্তু তোমার মনের দুর্বলতা তোমাকে অনেকখানি নীচে নামিয়ে এনেছে। যাও বিশ্রাম করোগে, আর শোন—কাল ভোরে নাছরিনের মৃত্যুদন্ডদেশ সবাইকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিও।

আচ্ছা সর্দার। রহমান বেরিয়ে গেলো।

রহমান চলে যেতেই বনহুর কক্ষ মধ্যে পায়চারী শুরু করলো।

গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে সে।

এক সময় বনহুর তার নিজস্ব ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিলো। তারপর রিভলভারটা তুলে নিলো হাতে। অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। এগিয়ে চললো বনহুর জোবাইদার কবরস্থানের দিকে।

ঘন ঝোপ—ঝাপের ভিতর দিয়ে গোপনে এগুতে লাগলো সে। দক্ষিণ হস্তে গুলী ভরা রিভলভার।

কবরের অদূরে পৌঁছতেই বনহুরের কানে এলো একটা চাপা করুণ কান্নার সুর।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর, একটা ঝোপের আড়ালে আত্ম—গোপন করে দাঁড়িয়ে রইলো।

শব্দটা জোবাইদার কবরের পাশ থেকেই আসছে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে।

বনহুর সজাগ হয়ে কান পাতলো তবে কি রহমানের অনুমান সত্য! জোবাইদার প্রেত আত্মাই কি, রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে আস্তানার চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়? তবে কি রহমান এ সব যা দেখেছে সব বাস্তব? কিন্তু সবাই বিশ্বাস করলেও সে বিশ্বাস করতে পারেনা। মৃতের অশরীরী আত্মা কোনদিন---

বনহুরের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেলো ফিস ফিস করে কে যেন কথা বলছে, ব্যথা ভরা কণ্ঠস্বর।

বনহুর শুনতে চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুই বোঝা গেলো না।

কখন যে আকাশে মেঘ জমে, উঠেছিলো খেয়াল করেনি বনহুর; ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। চমকে উঠলো বনহুর—বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলো।

সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বৃষ্টি। বনহুর কবরের দিকে এগুতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তখন সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।

ফিরে এলো বনহুর নিজের কক্ষে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো—রহমান যা ভাবছে তা সম্পূর্ণটা মিথ্যা বা অহেতুক নয়। সত্যই এটা অতৃপ্ত আত্মা তার আস্তানায় কার অপেক্ষায় যেন হা হুতাশ করে মরছে। কিন্তু কে সে; বনহুর তাকে আবিষ্কার করবেই করবে।

বনহুর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে দরজা খুলে যায় তার শিয়রে এসে দাঁড়ায় ছায়ামূর্তি। সমস্ত শরীর তার কালো কাপড়ে ঢাকা।

সমস্ত রাত্রি জাগরণের ফলে বনহুর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ছায়ামূর্তি অর্দ্ধনির্বাপিত মশালের আলোতে বনহুরের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অতৃপ্ত নয়নে। কালো আলখেল্লার মধ্যে চোখদুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে ঠিক ভোরের তারার মত। বনহুর নিজের শরীরে কোন চাদর চাপা না দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ছায়ামূর্তি ওদিকের আলনা থেকে শালের চাদরটা নিয়ে বনহুরের গায়ে বেশ করে দিয়ে দিলো। তারপর যেমনি এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো মন্থর গতিতে।

❑

ভোরে বনহুরের ঘুম ভাংতেই হাই তুলে বিছানায় উঠে বসলো।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো—সর্দার!

বেলা হয়ে গেছে বড্ড।

বেশী বেলা হয়নি সর্দার, তবে কমও হয়নি। দরবার কক্ষে সবাই এসে হাজির হয়েছে। কাল যে খবরটা প্রচার করে দিতে বলেছিলেন---

হাঁ, দাও গে যাও। কথাটা বলেই অবাক হলো বনহুর—তার শরীরে এ শালের চাদরটা এলো কি করে! একটু চিন্তা করে বললো সে—আমি শোবার পর তুমি কি আবার আমার কক্ষে এসেছিলে?

না সর্দার, আমি আর আসিনি। কিন্তু কেনো?

বনহুর কিছু বলতে গিয়ে আর বললো না, একটু শব্দ করলো শুধু-হুঁ।

রহমান বনহুরের মুখভাব করে এবং কিছু সে তার কাছে গোপন করলো বুঝতে পেরে গম্ভীর হলো।

বনহুর বললো—যাও, আমার আদেশটা আস্তানার সকলের নিকট জানিয়ে দাও।

আপনি যাবেন কি সর্দার?

না, তুমি যাও।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

বনহুর আবার তাকালো নিজের দেহের দিকে—কে তার শরীরে চাদর চাপা দিয়েছিলো, সত্যি তাকে বাহবা না দিয়ে পারলো না বনহুর। কারণ তার মত এক জনের পাশে এসে তার দেহে কাপড় চাপা দেবার সাহস এ আস্তানায় কার হতে পারে।

❑

আজ সমস্ত আস্তানায় একটা গম্ভীর থমথমে ভাব বিরাজ করছে। আজকের রাত্রি গত হলেই নাসরিনের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। জোবাইদাকে হত্যা করার জন্যই তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

নাসরিনকে আস্তানার সবাই ভালবাসতো, স্নেহ করতো। কারণ নাসরিন ছিলো সদা হাস্যময়ী উদার প্রাণ যুবতী। কালু খাঁ জীবিত কালে নাসরিন খুব বড় ছিল না তার মৃত্যুর পর সে এতো বড় হয়েছে। বৃদ্ধা দাই মা আর অন্যান্য সকলের আন্তরিকতায় মানুষ হয়েছে সে। কাজেই ওকে সকলে অত্যন্ত ভালবাসতো।

নাসরিনের মৃত্যুদন্ডাদেশ সকলের মনে গভীর একটা বেদনার ছায়াপাত করেছে। কিন্তু কোন উপায় নেই—দস্যু বনহুরের আদেশ।

কারাকক্ষে নাসরিন শুনলো, কাল ভোরে তার জীবন—প্রদীপ নিভে যাবে চিরতরে। একটা করুণ ক্রন্দন তার কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে এলো প্রাণ ভরে কাঁদলো সে।

দাইমা তো মাথা কুটে কাঁদা শুরু করে দিয়াছে। নাসরিন কখনও জোবাইদাকে হত্যা করতে পারে না—এ কথাই সে বার বার উচ্চারণ করছে। দাইমার ক্রন্দনে বনহুরের আস্তানার পাষাণ প্রাচীরে প্রতিধ্বনি জাগছিল।

নূরী আজ ক'দিন তার কক্ষ থেকে বাইরে বের হয়নি। মনিকে নিয়ে সে সব সময় নিজের ঘরে ব্যস্ত রয়েছে এমন কি বনহুরের সঙ্গেও সে আর দেখা করেনি।

দাইমার কান্নার আওয়াজ তার কানে পৌঁছবে বলে সে নিজের ঘরের দরজা—জানালা শক্ত করে বন্ধ করে দিয়েছিলো। কেমন যেন একটা বিমর্ষ

ভাব নূরীর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, হাজার হলেও তার শিশু কালের সাথী—সহচরী কিনা।

বনহুর আজ কোথাও যায় নি, নিজের কক্ষে বসে কিছু চিন্তা করছিল; এমন সময় ঝড়ের বেগে কক্ষে প্রবেশ করলো বৃদ্ধা দাইমা বনহুরের জামার আস্তিন দু'হাতের মুঠায় আঁকড়ে ধরে চীৎকার করে উঠলো সে—বনহুর তুমি দস্যু হয়েছো বলে যা তা করবে? পারবে না আমি বেঁচে থাকতে তুমি পারবে না নাসরিনকে হত্যা করতে।

বনহুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আমার আদেশ—তাকে হত্যা করতেই হবে।

কেন? কেন তাকে হত্যা করবে?

নাসরিন জোবাইদাকে হত্যা করেছে বলে।

না, নাসরিন তাকে হত্যা করেনি।

সে নিজে স্বীকার করেছে—জোবাইদার হত্যাকারী সে নিজে।

তুমি জানো না বনহুর, নাসরিন তাকে হত্যা করতে পারে না। না না, কিছুতেই না। আমি নাসরিনকে হত্যা করতে দেবনা।

বনহুর এক ঝটকায় বৃদ্ধাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো—যাও এখান থেকে।

আমি যাবো না। যতক্ষণ না তুমি নাসরিনের মৃত্যুদন্ডাদেশ ফিরিয়ে নিয়েছো আমি যাবো না তোমার কক্ষ থেকে।

বনহুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো বৃদ্ধার দিকে। তার কলিং—বেলে হাত রাখলো।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো রহমান—সর্দার।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—একে নিয়ে যাও, যতক্ষণ নাসরিনের মৃত্যুদন্ড না ঘটেছে ততক্ষণ বন্দী করে রাখো।

পাপিষ্ঠ আমাকে বন্দী করবি। চিরদিন দস্যুতাকে সমর্থন করে এসেছি—আর নয়। আমিই তোকে হত্যা করবো--বৃদ্ধ কাপড়ের নীচ হতে একখানা সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বের করে আচম্‌কা বসিয়ে দিতে গেলো বনহুরের বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান খপ্ করে বৃদ্ধার ছোরা সহ দক্ষিণ হাতখানা ধরে ফেললো—এ তুমি কি করতে যাচ্ছো দাইমা?

ছেড়ে দাও আমি ওকে হত্যা করবো। দস্যুতার শেষ সমাধি করবো আমি---

বনহুর বললো—নিয়ে যাও ওকে।

রহমান দাইমাকে টানতে টানেতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর ওদিকের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলো কে যেন দ্রুত সরেগেলো ওপাশ থেকে।

অন্যান্য দিনের চেয়ে বনহুরকে আজ বেশী গম্ভীর মনে হচ্ছিলো। সব সময় কিছু যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে।

আজ একটি মাত্র রাত্র—তারপর জোবাইদার হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। সত্যই নাসরিন হত্যাকারী কিনা, তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে আজ রাতেই। আজ রাতেই আরও একটা রহস্য তাকে উদ্‌ঘাটন করতে হবে—কে এই জোবাইদার প্রেত আত্মার বেদে ছায়ামূর্তি। বনহুর গত রাতেই প্রেত আত্মার আত্ম প্রকাশের চরম পরিণতি ঘটাতে পারতো কিন্তু রহমানের সম্মুখে সে চায়না ও কাজ করতে।

কিন্তু আজ রাতে সে দেখবে—কে এই প্রেত আত্মা। কি উদ্দেশ্য নিয়ে সে তার আস্তানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোবাইদার কবরের পাশে জমাট অন্ধকারে কে —ই বা অমন করে রোদন করছিলো! বনহুরের কাছে এসব যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। জীবনে সে কোন দিন বিশ্বাস করেনি ভূতপ্রেত বা অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব। ছোট বেলা হতেই বনহুর ভয়হীনভাবে মানুষ হয়েছে। দুর্বলতা কাকে বলে জানে না সে কোনদিন। অসাধ্য সাধন করাই বনহুরের জীবনের ব্রত।

আজ তার নিজের আস্তানায় প্রেত আত্মার আবির্ভাব উপলব্ধি করে হাসি পায় ওর। বনহুর জানে প্রেত আত্মার সাহস নেই তার আস্তানায় প্রবেশ করে।

বনহুর আজ এক মহা সমস্যার সম্মুখীন। মানুষ হত্যা করা তার কাছে তেমন কিছু নয়, কিন্তু জোবাইদার হত্যা তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। জোবাইদার হত্যাকারী হিসাবে নাসরিনকে কারারুদ্ধ করা হলেও আসলে নাসরিন হত্যাকারী নাও হতে পারে সে হয়তো মনের কোন ব্যথা চাপতে গিয়ে নিজেকে জোবাইদার হত্যাকারী বলে প্রমাণ করছে। আসলে সে—ই হত্যাকারী কিনা এর নিগুঢ় প্রমাণ দরকার এবং সে প্রমাণ আজ রাতেই তাকে সংগ্রহ করতে হবে।

বনহুরের সম্মুখে আজ সারাটা দিন কেউ আসতে সাহসী হয়নি একমাত্র রহমান ছাড়া। বনহুর আজ রহমানকেও এড়িয়ে চলেছে, বেশীক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলেনি সে!

দিন গিয়ে এক সময় রাত হয়ে এলো।

আস্তানায় সূর্যালো প্রবেশের কৌশলে ব্যবস্থা করছিলো সূর্যের আলো নিভে যেতেই আস্তানার আলোগুলি জ্বলে উঠলো -- মশালের আলো।

কিন্তু বনহুর আজ আদেশ দিলো সব আলো নিভিয়ে ফেলতে। রহমান স্বয়ং এ আদেশ প্রচার করলে আস্তানার মধ্যে। বনহুরের আস্তানায় আলো নিভিয়ে ফেলার আদেশ এই সর্ব প্রথম।

বনহুরের অনুচরগণ সকলেই অবাক হলো, এমন অদ্ভূত আদেশের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না।

এমন কি আস্তানার কারাকক্ষগুলিও আজ অন্ধকার।

রাত বেড়ে আসছে।

বনহুরের কক্ষে দেয়াল ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে বেজে চলছে। শয্যায় শয়ন করে ঘড়িটার শব্দ শুনছিলো বনহুর।

রাত যখন তিনটা বাজলো, সমস্ত আস্তানা যখন সুপ্তির কোলে ঢলে পড়ছে, বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। শরীরে তার জমকালো পোষাক পরাই ছিলো।

রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে অগ্রসর হলো অতি সন্তর্পণে।

জমাট অন্ধকারে বনহুরের আস্তানা আজ অন্ধকার। বনহুর এগিয়ে চলেছে, চারিদিকে সর্তক দৃষ্টি রেখে অতি গোপনে যাচ্ছে সে—

বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে—ঠিক সেই সময় একটা লঘু পদশব্দ তার কানে এসে পৌঁছলো। অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে কেউ যেন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বনহুর চট করে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করলো। স্পষ্ট দেখতে পেলো—একটা ঝাপসা কালো মূর্তি মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

বনহুর এই মুহূর্তে মূর্তিটাকে গ্রেপ্তার করতে পারতো কিন্তু তা না করে নিশ্চুপ অনুসরণ করলো ছায়ামূর্তিটাকে।

বনহুরের চোখ দু'টি অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। দক্ষিণ হস্তে গুলি ভরা রিভলভার। ছায়ামূর্তিটিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে ছায়ামূর্তি আস্তানার দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর তার কালো আবরণে আচ্ছাদিত।

ছায়ামূর্তিটি এবার সোজা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বনহুর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতিক্ষা করছে। হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো ছায়ামূর্তিটা।

বনহুরও এবার সেই দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়ালো। একটা হাসির রেখা তার ঠোটের কোণে ফুটে উঠলো অন্ধকারে। বনহুরও অদৃশ্য হলো এবার দেয়ালের মধ্যে।

গহন বন।

ছায়ামূর্তি সন্তর্পণে বনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো। ঝোপ ঝাড় ছাড়িয়ে চলেছে মূর্তিটা।

বনহুর বেশ কিছুটা দূরে ছায়ামূর্তির উপর লক্ষ্য রেখে এগুচ্ছে। কোন রকম যেন টের না পায় ছায়ামূর্তি সেদিকে বনহুরের সতর্ক লক্ষ্য আছে।

জোবাইদার কবরের দিকে এগিয়ে চলেছে ছায়ামূর্তি। বনহুরও সেইদিকে যাচ্ছে, লক্ষ্য তার ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তি জোবাইদার কবরের পাশে থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে জায়গাটা কালো হয়ে উঠেছে, ছায়ামূর্তির শরীরের পোষাকও কালো থাকায় তাকে আর মোটেই দেখা যাচ্ছে না।

বনহুর জোবাইদার কবরের অতি নিকটে একটা গাছের গুঁড়ির আড়ারে লুকিয়ে পড়লো। সেখান থেকে ছায়ামূর্তিটাকে দেখা না গেলেও তার গতিবিধি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ কোন শব্দই শোনা গেলো না। বনহুর কান পেতে প্রতিক্ষা করছে--এবার শোনা গেলো একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেউ যেন।

বনহুর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো আজ সে আবিষ্কার করবে জোবাইদার প্রেত আত্মার আসল পরিচয়। তার সঙ্গে প্রমাণ করবে —কে জোবাইদার সত্যিকারের হত্যাকারী। নাসরিনই জোবাইদাকে হত্যা করেছে কিনা জানতে চায় বনহুর।

অনেকক্ষণ কেটে গেলো, ছায়ামূর্তি এবার কবরের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো বলে মনে হলো বনহুরের। ফিরে চললো আবার যে পথে এসেছিলো সেই পথে।

আবার আস্তানায় প্রবেশ করে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করলো ছায়ামূর্তি—এবার সে অগ্রসর হলো নাসরিনের কারাকক্ষের দিকে।

বনহুরও এবার তাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগলো। ছায়ামূর্তি সোজা নাসরিনের কারাকক্ষের পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর চট্ করে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে লুকিয়ে পড়লো।

ঠিক সেই সময় আর একজন অতি সতর্কতার সঙ্গে এসে দাঁড়ালো অন্য একটি থামের আড়ালে।

অজানিত এই লোকটি বনহুর আর ছায়ামূর্তিটাকে সর্বপ্রথম হতেই ফলো করে আসছিলো। তার শরীরেও জমকালো পোশাক— অন্ধকারে তাকে যেন কেউ দেখে না ফেলে সেদিকে তার অত্যন্ত সতর্কতা ছিলো।

নাসরিনের কারাকক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছায়ামূর্তি ফিস ফিস করে ডাকলো—নাসরিন ---নাসরিন--

চমকে উঠলো বনহুর—এ কণ্ঠস্বর তার যে অতি পরিচিত।

আর চমকে উঠলো ঐ অজ্ঞাত লোকটি।

বনহুর সজাগ হয়ে দাঁড়ালো সে জানে না আর একজন তাদের দু'জনাকেই প্রথম থেকে লক্ষ্য করে আসছে।

এবার শোনা গেলো ব্যথাকরুণ গলায় আওয়াজ—আমাকে ক্ষমা করো নাসরিন, আমাকে ক্ষমা করো, যে পাপ আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

নাসরিনের গলার আওয়াজ শোনা গেলো—তা হয় না, সবাই জানে, আমিই জোবাইদার হত্যাকারী, কাজেই -----

চুপ। আর ও কথা বলো না। নাসরিন আমার এ বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই শ্রেয়। কি হবে এ দুর্বিসহ জীবন বয়ে? ছায়ামূর্তি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

এবার নাসরিনের কণ্ঠ—তোমার যদি দুর্বিসহ জীবন হয় তাহলে আমারই বা কি লাভ বেঁচে থেকে বলো। বরং তুমি বেঁচে থাকলে---

না না, তা হয় না নাসরিন তা হয়না। আমি জোবাইদার হত্যাকারী—ভোরে আমারই মৃত্যুদন্ড হবে,তোমার নয়।

ছায়ামূর্তি কথাটা শেষ করে দ্রুত চলে যাচ্ছিলো।

কারাকক্ষ ছেড়ে কিছুদূর অগ্রসর হতেই বনহুর ছায়ামূর্তির সম্মুখে এসে দাঁড়ালো দৃঢ় মুষ্ঠিতে চেপে ধরলো ছায়ামূর্তির একটি হাত—জোবাইদাকে তুমিই তাহলে হত্যা করেছিলে?

ছায়ামূর্তি এতোটুকু চমকালো না, বললো—হাঁ আমিই জোবাইদাকে হত্যা করেছি।

কি অপরাধ করেছিলো সে তোমার?

জানি না।

বলতে হবে তোমাকে।

আমি কোন কথা বলবো না।

কাল ভোরে তোমাকে গুলী করে হত্যা করা হবে।

বেশ, আমি তাই চাই।

ছায়ামূর্তি এবার এক ঝটকায় বনহুরের হাতের মুঠা থেকে হাত খানা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলো।

বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ফিরে চললো নিজের কক্ষের দিকে। জোবাইদার প্রেত আত্মা ভেবে আস্তানার লোকেরা যে

ছায়ামূর্তিটি সন্দেহ করে এসেছিলো, বনহুর আজ তার আসল পরিচয় পেয়েছে। আরও জানতে পেরেছে— নাসরিন জোবাইদার হত্যাকারিণী নয়।

বনহুর জানতো, কে এই নর হত্যাকারী তবু সে আসল হত্যাকারী উদ্‌ঘাটনের জন্য উন্মুখ ছিলো।

এবার তার সব সন্দেহের অবসান হয়েছে কিন্তু এতে তার চিন্তাধারা লাঘব হলো না বরং আরও বেড়ে গেলো চরম আকারে। নিজ কক্ষে প্রবেশ করে হস্তস্থিত রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো টেবিলে। গভীর একটা দুশ্চিন্তার ছাঁপ ফুটে উঠলো তার মুখমন্ডলে।

ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করছে বনহুর।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো রহমান।

বনহুর পদশব্দে চমকে উঠলো, এই বুঝি সে জীবনে সর্বপ্রথম আচমকা চমকে উঠলো। ফিরে তাকাতেই দেখলো—রহমান দাঁড়িয়ে আছে নত মস্তকে।

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কিছু ভাবলো, তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে ডাকলো —রহমান।

সর্দার।

তুমি এসেছো ভালই হলো, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে এসো রহমান!

রহমান বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর আবার পায়চারী করতে শুরু করলো। কিছু যেন বলতে চায় কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছে না সে।

রহমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিক্ষা করতে লাগলো। তার মুখ ভাবও বেশ গম্ভীর ভাবাপন্ন।

বনহুর পায়চারী বন্ধ করে রহমানের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। কিছু বলতে গেলো কিন্তু পারলো না।

রহমান বলে উঠলো—সর্দার, আমি জানি আপনি কি বলতে চান।

রহমান। অস্ফুট শব্দ করে উঠলো বনহুর।

হাঁ সর্দার আমি সব শুনেছি।

শুনেছো! শুনেছো রহমান? বলো এখন উপায়?

সর্দার কাল ভোরে নাসরিনের মৃত্যুদন্ড---

হবে না! রহমানের কথা মাঝখানে বলে উঠলো বনহুর।

তাহলে?

আমি সেই কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি রহমান। নাসরিনের মৃত্যুদন্ডাদেশ বাতিল করতে হবে।

কিন্তু---

দোষীকে শাস্তি দেওয়াই আমার কাজ। রহমান, জোবাইদার হত্যাকারী কি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছো।

হাঁ সর্দার; কিন্তু কি করে তাকে আপনি ---

বনহুর কাউকে ক্ষমা করে না, নিজের পিতাকেও না।

তাহলে কি আপনি---?

হাঁ, জোবাইদার হত্যাকারীকে উচিৎ সাজা পেতে হবে।

সর্দার।

কিন্তু কোন উপায় নেই।

সর্দার, ওর বদলে আমাকে মৃত্যুদন্ড দিন, আমিই প্রকাশ্য দরবারে নিজকে জোবাইদার হত্যাকারী বলে প্রমাণ করবো।

তা হয় না রহমান, বনহুর কোনদিন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় না। তুমি যাও, কাল জোবাইদার হত্যাকারী প্রেত আত্মাবেশী নূরীর মৃত্যুদন্ড হবেই।

সর্দার--রহমান বনহুরের পা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। নূরীকে মাফ্ করে দিন সর্দার।

যে অপরাধ সে করেছে তার মাফ নেই।

সর্দার! সর্দার, কেউ জানে না নূরী জোবাইদার হত্যাকারী।

কিন্তু আমি জানি, আমি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ পেয়েছি। জোবাইদাকে হত্যা করে সে ভুল করেছে।

সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে নূরী, দৃঢ়কণ্ঠে বলে—না, আমি ভুল করিনি। জোবাইদাকে হত্যা না করলে সেই দন্ডে সে হত্যা করতো বনহুরকে।

রহমান বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—সরদারকে সে হত্যা করতো? বলো কি নূরী?

হাঁ, জোবাইদা তোমাদের সর্দারকে খুন করতো।

বনহুর অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো—তাই তাকে নিমর্মভাবে হত্যা করেছো?

হাঁ, আমি সব সহ্য করতে পারবো, কিন্তু তোমাকে কেউ হত্যা করবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না। জোবাইদার হত্যা কারী আমি—আমাকে তুমি মৃত্যুদন্ড দাও কোন দুঃখ নেই।

তাই হবে—কাল ভোরে তোমাকে হত্যা করা হবে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর।

রহমান বলে উঠলো—সর্দার!

যাও, তোমরা আমাকে বিরক্ত করো না।

রহমান মাথা নত করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো।
নূরীও বেরিয়ে গেলো পরক্ষণে।

❑

মনি অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

পাশে এসে দাঁড়ালো নূরী, চোখে তার অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে। কাল ভোরে তার মৃত্যুদন্ড। মরণে নূরীর এতোটুকু বেদনা বা দুঃখ নেই। দুঃখ—মনিকে ছেড়ে যেতে হবে তাই---

জোবাইদাকে হত্যা করার পর নিজকে সে বাঁচাতে চেয়েছিলো। তাই সেদিন নাসরিনের ম্লান মুকের দিকে তাকিয়েও নূরী নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেনি। কিন্তু নিজের মনের কাছে সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলো না। রাত হলেই জোবাইদার আত্মা যেন তার গলা টিপে ধরতে আসতো নূরী আতঙ্কে শিউরে উঠতো কিছুতেই স্থির থাকতে পারতো না। অন্ধকারে আত্মগোপন করে বেরিয়ে পড়তো। আস্তানার বাইরে যাবার গোপন দ্বার যা কারো জানা ছিলো না সেই দ্বারের সন্ধান জানতে পেরেছিলো নূরী। বনহুর যেদিন জোবাইদাকে বলেছিলো "আমাকে হত্যা করার পর ঐ পথে পালিয়ে যাবে, কেউ তোমার সন্ধান পাবে না।" তখন নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছিলো বনহুরের উক্তিটা।

সেই পথেই নূরী আস্তানার বাইরে যাওয়া—আসা করতো শরীরে থাকতো তার জমকালো ড্রেস। জোবাইদার কবরের পাশে যেতো এবং মনের বেদনা লাঘব করার জন্য রোদন করতো সে। কখনও বা যেতো নাসরিনের কারাকক্ষের পাশে। নাসরিনের মৃত্যুদন্ডাদেশ তাকে উন্মাদ করে তুলেছিলো। জোবাইদাকে সে হত্যা করেছে আবার তার জন্যই নির্দোষ নাসরিনের মৃত্যু ঘটবে, ভাবতেই নূরীর বুকের মধ্যে তুফান বয়ে যেতো। নূরী আস্তানার মধ্যে অস্থিরভাবে চলাফেরা করতো। সবাই তাকে দেখেছিলো সন্দেহ করেছিলো—ছায়ামূর্তি অন্য কেউ নয়, জোবাইদার প্রেত—আত্মা।

আজ বনহুর ছায়ামূর্তির আসল পরিচয় জানতে পেরেছিলো। জানতে পেরেছিলো —কে এই জোবাইদার প্রেত আত্মাবেশী ছদ্মবেশিনী। বনহুরের প্রথমেই সন্দেহ জেগেছিলো, সন্দেহ তার সত্যে পরিণত হলো।

নূরী মনিকে বুকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। এই রাতটুকুই তার জীবনের শেষ সময় কাল ভোরে নাসরিনের মুক্তি হবে আর তার হবে মৃত্যু।

নীরবে অশ্রু বর্ষণ করে চলেছে নূরী।

এমন সময় দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে চাপা কণ্ঠস্বর —নূরী—

নূরী উঠে দাঁড়ালো দরজা খুলে দিতেই অবাক হলো—রহমান দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

নূরীকে দেখেই রহমান ব্যস্তভাবে বললো—শীগ্‌গীর তৈরী হয়ে নাও নূরী এক্ষুণি পালাতে হবে।

অবাক কণ্ঠে বললো নূরী —এ তুমি কি বলছো রহমান?

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না---

না না, আমি পালাতে পারবো না। রহমান নূরী মৃত্যু ভয়ে ভীত নয় জেনো।

নূরী, আমি তোমাকে মরতে দেবো না।

তা হয় না রহমান।

তোমাকে বাঁচতে হবে নূরী, তোমাকে বাঁচতে হবে।

তুমি আমাকে ভালবাসো জানি, সেই কারণেই তুমি আমার মৃত্যুদন্ড সহ্য করতে পারবেনা, এই তো?

না, তা নয় নূরী। আমি তোমাকে ভালবাসি সত্য কিন্তু তার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসেন আমাদের সর্দার, তোমাকে--- তোমাকে বাদ দিয়ে তিনি বাঁচতে পারেন না।

রহমান! অস্ফুট শব্দ করে উঠলো নূরী।

রহমান বললো আবার—আইনের কাছে সর্দার কাউকে ক্ষমা করেন না, করতে পারেন না। তাই—তাই তিনি তোমার প্রতি---কিন্তু জানো নূরী, সর্দারের হৃদয়ে আজ কি মর্মবেদনা শুরু হয়েছে? অসহ্য যন্ত্রণা তার অন্তরকে দগ্ধীভূত করে চলেছে।

আমি সব জানি সব বুঝি নূরী। সর্দার কাল ভোরে তোমার মৃত্যুদন্ড দেবেন সত্য কিন্তু তার জীবনের একটা অংশ খসে যাবে সেই দন্ডে। নূরী সর্দার তোমার মৃত্যু সহ্য করতে পারবে না। আমি জানি তুমি তার কতখানি প্রিয়।

রহমান এসব তুমি কেনো আমাকে শোনাচ্ছো?

যেমন করে হোক তোমাকে বাঁচতে হবে। তোমার মৃত্যু শুধু মনিকেই মাতৃহারা করবে না, সমস্ত আস্তানায় বিষাদের কালিমা লেপন করে দেবে। নূরী, সর্দার ভেংগে পড়বে তোমার অদর্শনে---

রহমান ---রহমান ---

নূরী সময় বেশী নেই, তৈরী হয়ে নাও।

কিন্তু---

আর কিন্তু নয়।

নাসরিন মৃত্যু! বিনা দোষে নাসরিনের মৃত্যু হবে—এই তুমি চাও?

না। নাসরিনের মৃত্যুদন্ড হবে না। আমি একটা চিঠিতে সব লিখেছি এবং কায়েসকে সব খুলে বলেছি। কাল ভোরে প্রকাশ্য দরবারে সে ঐ চিঠি পাঠ করে সবাইকে জানিয়ে দেবে—নাসরিন জোবাইদার হত্যাকারী নয়। সর্দার নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হবেন তোমাকে আর আমাকে না দেখে। নূরী, এখন আমরা বহুদূরে চলে যাবো, কান্দাই সীমানা পার হয়ে আর এক রাজ্যে।

এটা কি ভাল হবে রহমান?

আমি জানি ভাল হবে, তুমি বাঁচতে না চাইলেও তোমাকে বাঁচতে হবে নূরী---

আর মনি? মনিকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো?

মনিও থাকবে আমার সঙ্গে।

রহমান!

চলো নূরী আর বিলম্ব করো না।

নূরী ঘুমন্ত মনিকে কোলে তুলে নিলো—চলো।

রহমান নূরীর কোলে থেকে মনিকে নিজের কোলে নিয়ে অন্ধকারে অগ্রসর হলো।

রহমান কায়েসকে সব কথা বলেছিলো।

আস্তানার বাইরে কায়েস অশ্ব দুলকী ও আরও একটি অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

রহমান নূরী ও মনিসহ এসে দাঁড়ালো কায়েস এবং অশ্ব দুইটির পাশে।

মনি জেগে উঠেছিলো বললো—আমাকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছো আম্মি?

নূরী বললো—অনেক দূরে—পরে শুনো। এখন চুপ করে থাকো বাবা।

রহমান মনিসহ উঠে বসলো দুল্‌কীর পিঠে। আর নূরী অপর অশ্বটির পিঠে।

কায়েস অশ্রুভরা নয়নে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আবার কবে দেখা হবে?

রহমান বললো—জানিনা।

নূরী বললো—কায়েস, আমার বনহুর রইলো ওকে দেখো।

কায়েস বললো—আমরা থাকতে সর্দারের জন্যে চিন্তা করোনা নূরী। খোদ হাফেজ। বললো নূরী।

অশ্ব দুটি তখন ছুটতে শুরু করেছে।

রহমান আর নূরীর অশ্ব অদৃশ্য হতেই কায়েস ফিরে চললো। আজ থেকে রহমানের সমস্ত কাজ তারই করতে হবে। সব দায়িত্ব এখন কায়েসের।

রহমান জানতো তার অবর্তমানে একমাত্র কায়েস ছাড়া কেউ তার কার্যভার গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। রহমান তাই কায়েসকেই বিশ্বাস করে সব কথা বলেছিলো, আর একটা চিঠি সে লিখে রেখে গিয়েছিলো বনহুরের কাছে।

❑

বনহুর দরবার —কক্ষে এসে পৌঁছলো, তার মুখমন্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন।

সবাই তখন দরবার কক্ষে এসে জমায়েত হয়েছে।

বনহুরের অনুচরগণের প্রত্যেকেরই মুখে আজ বিষাদের ছায়া। সকলেই নত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কোন কথা বলছে না। আজ নাসরিনের মৃত্যুদন্ড—এ কথা জানে বলেই কারো মুখ হাসি নেই। আস্তানায় সকলেই ভালবাসতো নাসরিনকে। তাই নাসরিনের মৃত্যুদন্ড কেউ খুশী মনে গ্রহণ করতে পারছিলো না।

জোবাইদাকে যে তারা ভালোবাসতো না তা নয়, কিন্তু যে গেছে আর সে ফিরে আসবে না—তাই বনহুরের অনুচরগণ চায় না নাসরিনের মৃত্যুদন্ড হয়।

কিন্তু সর্দারের আদেশ লঙ্ঘন হওয়ার উপায় নেই।

বনহুর তার সুউচ্চ আসনে উপবেশন করতেই কায়েস এসে দাঁড়ালো রহমানের স্থানে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—রহমান কোথায়? ওকে দেখছি না কেনো?

কায়েস মাথা নত করে বললো— রহমান কোথায় জানি না, তবে এই চিঠিখানা তার কক্ষে পেয়েছি।

চিঠি!

হাঁ সর্দার।

রহমান কায়েসের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো, তারপর আরও দু'তিনবার পড়লো সে চিঠিখানা।

বনহুরের মুখভাব ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাচ্ছিলো—লক্ষ্য করছিলো তার অনুচরগণ। সবাই বুঝতে পারলো—ঐ চিঠিখানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি।

বনহুর এবার কায়েসকে লক্ষ্য করে বললো—দরবার কক্ষে নাসরিনকে নিয়ে আসার আদেশ দাও।

কায়েস ইংগিৎ করতেই দুইজন অনুচর বেরিয়ে গেলো।

অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলো তারা নাসরিন সহ।

এখনও নাসরিনের হাত ও কোমারে দড়ি বাঁধা রয়েছে।

বনহুরের সম্মুখে নত মস্তকে দাঁড়ালো দড়ি বাধা রয়েছে।

বনহুরের সম্মুখে নত মস্তকে দাঁড়ালো নাসরিন। মুখভাব করুণ ব্যথা ভরা; সারা রাত্রি তার ঘুম হয়নি। মুখ শুকনো, চোখ দু'টি জবা ফুলের মত লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

দরবার কক্ষস্থ সকলে একবার বেদনা ভরা চোখে হস্ত—পদ বন্ধন অবস্থায় নাসরিনের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। সবাই রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতিক্ষা করছে---এবার সর্দার নাসরিনের মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেবেন।

দরবার—কক্ষে একটু কোন শব্দ হচ্ছে না। সবাই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত।

বনহুর চিঠিখানায় আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—জোবাইদার হত্যাকারী সন্দেহে নাসরিনের মৃত্যুদন্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু নাসরিন জোবাইদার হত্যাকারী নয়।

কক্ষমধ্যে একটা মৃদু আনন্দধ্বনি হলো।

বনহুরের মুখের পানে তাকালো নাসরিন তার চোখ দুটো যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

বনহুর বললো আবার—নাসরিনকে মুক্ত করে দাও।

কয়েস নিজ হস্তে নাসরিনের হাত এবং কোমরের বন্ধন মুক্ত করে দিলো।

নাসরিন ছুটে গিয়ে বনহুরের পা জড়িয়ে ধরলো—সর্দার।

যাও নাসরিন তুমি মুক্ত।

সর্দার! নাসরিন কথাটা উচ্চারণ করে উঠে দাঁড়ালো।

দরবার—কক্ষে সকলেরই মুখের ভাব প্রসন্ন হলো।

মাহবুব বলে উঠলো—সর্দার তাহলে জোবাইদাকে কে হত্যা করেছে আমরা জানতে চাই?

একটু পরেই জানতে পারবে। কায়েস তুমি এই চিঠিখানা পড়ে এদের শুনিয়ে দাও।

কায়েস বনহুরের হাত থেকে রহমানের লিখিত চিঠিখানা নিয়ে পড়তে শুরু করলো—

"সর্দার, জোবাইদার হত্যাকারীর সন্ধান
আমি পেয়েছি। নাসরিন সম্পূর্ণ নির্দোষ,
জোবাইদার হত্যাকারী সে নয়। আজ কিছু
দিন যাবৎ আস্তানায় যে প্রেত আত্মার আবির্ভাব
ঘটেছিলো, আসলে সেই ছিলো জোবাইদার
হত্যাকারী। আজ রাতে আমি তাকে গ্রেপ্তার
করেছিলাম এবং প্রেত আত্মাবেশী ছায়ামূর্তির
আসল পরিচয় আমি পেয়েছি সে হচ্ছে নূরী।
নূরীই জোবাইদার হত্যাকারিণী। জানি নূরী
অপরাধী এবং তার উচিৎ শাস্তি মৃত্যুদন্ড।
কিন্তু আমি তাকে মরতে দিতে পারি না। তাই
সর্দারের বিনা অনুমতিতে আমি নূরী আর মনিকে
নিয়ে দূরে চলে গেলাম। কোথায় যাচ্ছি জানি
না। হয়তো জীবনে আর ফিরে আসবো কিনা
তাও জানি না।

সর্দার, আমাকে ক্ষমা করবেন। নূরীর কোন
দোষ নেই, সে মরণে ভয় করে না। আমি তাকে
জোরপূর্বক নিয়ে গেলাম। মনির জন্য চিন্তা নেই,
ওকে আমি মানুষ করবো।

—আপনার বিশ্বস্ত অনুচর
রহমান

কায়েস চিঠি পড়া শেষ করলো।

কক্ষমধ্যে একটা সুঁচ পড়ার শব্দও শোনা যাবে না। বনহুর স্থিরভাবে বসেছিলো তার আসনে। মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর কঠিন। চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।

এবার বনহুর উঠে দাঁড়ালো দৃঢ় কণ্ঠে বললো—তোমরা নিশ্চয়ই সব বুঝতে পেরেছো। রহমান নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করেছে। নূরী দোষী জেনেও তাকে সে রক্ষার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করেছে। রহমানকে এর জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে---

কায়েস বলে উঠলো—সর্দার, রহমান যা করেছে তা অতি মহান কাজ। আমরা সবাই তার হয়ে ক্ষমা চাইছি।

ক্ষমা!

হাঁ সর্দার, আমরা সবাই রহমানের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাই। এক সঙ্গে বলে উঠলো সকলে।

বনহুর পূর্বের ন্যায় হুঙ্কার ছাড়লো—আমার আদেশ—তোমরা রহমান আর নূরীকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো। নিয়মের ব্যতিক্রম করা বনহুরের স্বভাব নয়। যাও, আজ তোমাদের ছুটি।

বনহুরের অনুচরগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

তারা জানে সর্দার ক্রুদ্ধ হয়ে কোনদিন তাদের ছুটি দেন না, আজ তার পরিবর্তন লক্ষ্য করে খুশী হলো সবাই।

অল্পক্ষণে দরবার কক্ষ ফাঁকা হয়ে গেলো।

নাসরিনও বেরিয়ে গেলো ধীর পদক্ষেপে।

কায়েস এবার বললো—সর্দার, রহমান অপরাধী হতে পারে, কিন্তু তার হৃদয় বড়ই উন্নত। তাকে ক্ষমা করে দিন সর্দার।

বার বার এক অনুরোধ আমাকে করো না কায়েস! এই দন্ডে আমি তোমাকে হত্যা করার আদেশ দিতাম, কারণ তুমি ও রহমান ও নূরীকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছো।

সর্দার!

আমার কাছে গোপন করার চেষ্টা করো না কায়েস।

কায়েস আর কোন কথা বলতে পারলোনা। সর্দারের মুখের উপর মিথ্যা বলার সাহস হলো না তার।

বনহুর বললো—কায়েস, জানো —আমি কোন দিন অপরাধীকে ক্ষমা করিনা। রহমান আর নূরীকে পালানোর সুযোগ দিয়ে তুমি ভুল করেছো। যত শীঘ্র পারো রহমান আর নূরীকে খুঁজে বের করে আমার সম্মুখে হাজির করো। যাও---

সর্দার আমি জানি না তারা কোথায় গেছে।

জানোনা আবার মিথ্যা কথা?

সর্দার, আমি শপথ করে বলছি—তারা কোথায় গেছে জানিনা। কান্দাই শহরে তারা নেই—এটুকুই শুধু জানি।

বনহুর কিছু চিন্তা করলো, তারপর বললো —যাও, দাইমাকে কারাকক্ষ থেকে বের করে দাও।

আচ্ছা সর্দার।

বেরিয়ে যায় বনহুর।

কায়েস নত মস্তকে অনুসরণ করলো সর্দারকে।

বনহুর বেরিয়ে এলো দরবার—কক্ষ থেকে।

এই মুহূর্তে তাকে যেতে হবে কান্দাই রাজধানীতে। মনিরার চোখের পট্টি আজ খুলে দেওয়ার তারিখ, কিন্তু বনহুরের মনের অবস্থা আজ অত্যন্ত খারাপ। কেনো তা সে নিজেই জানেনা।

কায়েসকে বললো বনহুর—কায়েস, তাজকে প্রস্তুত করতে হলো আমাকে যেতে হবে।

এখনই কি বাইরে যাবেন সর্দার?

হাঁ।

কায়েস চলে গেলো।

বনহুর এগুলো নিজের কক্ষে।

স্বাভাবিক ড্রেসে বনহুরের শহরে যাওয়া সম্ভব নয়, রাতের অন্ধকারেই সে শহরে যেতো। আজ তার ব্যতিক্রম ঘটলো। বনহুর যখন ড্রেসিংরুম থেকে বের হলো তখন তার দেহে সম্পূর্ণ ডাক্তারী ড্রেস। চোখে চশমা, গলার সঙ্গে লটকানো স্ট্যাথিসস্কোপ।

বনহুর কায়েসের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলো, তারপর বেরিয়ে গেলো আস্তানা থেকে।

মস্ত শহর আরাকান।

বিচিত্র শহরে বৈচিত্রময় মানুষ। অদ্ভুত তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, অদ্ভুত তাদের কথাবার্তা আর চাল-চলন। শহরে দোকান-পাট এবং দালান -কোঠাগুলিও অন্যান্য দেশের চেয়ে ভিন্ন রকমের। পথ-ঘাট-গুলিও সম্পূর্ণ আলাদা।

অজানা অচেনা দেশ আরাকান শহর।

রহমান নূরী আর মনি সহ এই শহরে এসে উপস্থিত হলো। কান্দাই শহর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই শহর। এখানে কেউ চেনেনা রহমান নূরী আর মনিকে।

একটা গাছের তলায় নেমে দাঁড়ালো ওরা তিন জনা। ক্ষুধায় পিপাসায় অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিলো নূরী আর মনি। বিশেষ করে মনির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো রহমান।

সারাটা রাত্রি আর গোটা একটা দিন মিলে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তারা এই আরাকান শহরে এসে পৌছতে সক্ষম হয়েছে।

নূরী বললো—আর যেতে পারবো না, কণ্ঠনালা আমার শুকিয়ে এসেছে। আর মনির অবস্থা দেখছো?

রহমান মনিকে কোলে নিয়ে রুমালে তার কপালের ঘাম মুছে দিচ্ছিলো, বললো—নূরী, তুমি ভেবোনা, এই আরাকান শহরেই আমরা থাকবো। কান্দাই শহর হতে এ শহর অনেক বড়। এখানে নানা দেশের মানুষ বাস করে। আমরা তাদের মধ্যে আত্মগোপন করে জীবন কাটিয়ে দেবো। নূরী, দস্যুতা আমি করবো না, সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করাই আমার কাজ। আর মনিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করাই হবে আমার জীবনের ধর্ম।

নূরীর চোখে—মুখে ফুটে উঠে এক দীপ্তভাব, বলে সে—হাঁ আমিও তাই চাই রহমান। দস্যু দুহিতা আমি, কিন্তু দস্যুতাকে আমি এখন ঘৃণা করি।

রহমান অস্ফুট আনন্দধনি করে উঠে—নূরী। নূরী সত্যি তুমি এ কথা বলছো?

হাঁ সত্যি।

রহমান আর নূরীর যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন মনি নীরবে অশ্রু বর্ষণ করছিলো।

রহমান বললো— মনি কেঁদো না বাবা, আমি তোমার জন্য এক্ষুণি খাবার নিয়ে আসছি।

মনি বলে উঠলো—আমি বাপির কাছে যাবো। আমার ক্ষুধা পায়নি।

মনির কথায় অবাক হলো রহমান।

নূরীর চোখ দুটো অশ্রু ছলছল হলো বললো—তোমার বাপি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে মনি, আর তার কাছে যাওয়া হবে না।

না, আমি বাপির কাছে যাবো।

রহমান আর নূরী অনেক করে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো।

আশ্চর্য হলো নূরী— বনহুরের প্রতি মনির এতো অন্তরের টান হলো কি করে।

মনির কথায় নূরী আশ্চর্য হলেও রহমান বিস্মিত হলো না। সে জানে, মনি তার সর্দারকে? বনহুরের সঙ্গে যে মনির রক্তের সম্বন্ধ আছে তা এক রহমান আর কায়েস ছাড়া কেউ জানে না।

একটা হোটেল বাড়ীতে আশ্রয় নিল ওরা।

রহমান টাঙ্গী চালায়।

সারাদিন পথচারী আরোহীদের নিয়ে ভাড়া খাটে রহমান ফিরে আসে সন্ধ্যায়। আসার পথে ময়দা আর মাংস নিয়ে আসে।

নূরী প্রতিক্ষা করে রহমানের।

হয়তো মনি ঘুমিয়ে পড়ে।

রহমানের কোনদিন ফিরতে বিলম্ব হয়, চিন্তায়, অস্থির হয়ে পড়ে নূরী, এতোক্ষণ ফিরে না আসারই বা কারণকি? ছোট্ট চালা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘর্মাক্ত কলেবরে রহমান এসে দাঁড়ায় নূরীর সম্মুখে। গামছায় কপালের ঘাম মুছে বলে—অনেক দূরে গিয়েছিলাম তারই বড্ড দেরী হয়ে গেলো। মনি ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

হাঁ, মনি ঘুমিয়ে পড়েছে।

রহমান জামার পকেট থেকে একটা লাল রঙএর জামা বের করে বললো—মনির জন্য এনেছি।

কি দরকার ছিলো এখনই জামার?

একটিমাত্র জামা ওর সম্বল সব তো ছেড়ে এসেছো—তাই নিলাম।

নূরী রহমানের হাত থেকে জামাটা নিয়ে বললো—চলো খাবার ঠান্ডা হয়ে গেছে।

চলো নূরী।

রহমানকে খেতে দিয়ে নূরী পাশে বসে থাকে গল্প করে —কত দূরে গিয়েছিলো, কোথায় গিয়েছিলো—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে সে।

রহমান খেতে খেতে নূরীর কথার জবাব দেয়।

রহমানের খাওয়া শেষ হলে শুয়ে পড়ে সে। ওদিকের দড়ির খাটিয়া খানায় রহমান শোয়। আর মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে শোয় নূরী আর মনি।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর রহমান শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে!

মনিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে নূরীও চোখ বন্ধ করে কিন্তু ঘুম তার চোখে আসে না, নানা চিন্তার উদয় হয় তার মনের মধ্যে। রহমান তাকে বাঁচানোর জন্যই আজ সব কিছু ত্যাগ করে নিঃসম্বলভাবে বেরিয়ে এসেছে। শুধু তার জীবন রক্ষার জন্যই আজ সে সব ত্যাগ করেছে, কিন্তু কি লাভ এতে রহমানের। রহমান নূরীকে গভীরভাবে ভালোবাসে, সমস্ত অন্তর দিয়ে নূরীকে কামনা করে সে, একথা জানে—বুঝে নূরী। তবু নূরী কোন দিন রহমানকে ধরা দেবে না দিতে পারে না। ছোট বেলায় জ্ঞান হাবার পর সে একজনকেই ভালবেসেছে— সে হলো বনহুর। তারমন প্রাণ —জীবন সমর্পণ করেছে ওর কাছে। নূরী যত দূরেই সরে যাক তবু ভুলতে পারবে না কোন দিন তাকে।

বনহুর তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো—কিন্তু তার কি অপরাধ? আইনের চোখে সত্যই সে অপরাধী নরহত্যাকারী, বিচারের মৃত্যুদন্ডই তার প্রাপ্য।

বনহুরকে সে কোন সময় দোষ দিতে পারে না নিয়মের ব্যতিক্রম করা তার কাজ নয়। নিয়ম মেনে চলাই দস্যু বনহুরের কাজ।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নূরী, হঠাৎ একটা নিশ্বাসের শব্দে ঘুম ভেংগে গেলো তার। চোখ মেলে তাকাতেই বিস্ময়ে থ''মেরে গেলো, রহমান বসে আছে তার শিয়রে—নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

নূরী অস্ফুট কণ্ঠে বললো—তুমি।

রহমান সোজা হয়ে বসলো, শান্ত ধীরে কণ্ঠে বললো—নূরী, তোমাকে দেখছিলাম।

রহমান আমি জানতাম তুমি আমাকে এনে যে কোন সময় একটা কিছু দাবী করে বসবে।

নূরী, তুমি ভুল বুঝছো, আমি তোমাকে শুধু দেখছিলাম, তোমাকে স্পর্শ করার সাহস আমার নেই।

না না, আমি তোমার এ দৃষ্টি সহ্য করতে পারবো না।

নূরী, আমি এতোই হতভাগ্য যে, তোমাকে একটু প্রাণ ভরে দেখতেও পাবো না।

তুমি জানো—আমি ভালোবাসিনা তা---

নূরী, আমাকে মাফ করে দাও নূরী?

রহমান দু'হাতের মুঠায় নিজের চুল চেপে ধরে। অধর দংশন করতে থাকে সে।

নূরী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—রহমান, আমি আর কোন দিন তোমাকে এ—ভাবে দেখতে চাই না। যাও তুমি যাও ঘুমাও গে।

বেশ, আমি যাচ্ছি। নূরী, আমাকে ক্ষমা করো।

রহমান কথাটা বলে উঠে নিজের বিছানায় চলে যায়।

নূরী মনিকে বুকে টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

রাত বেড়ে আসে।

❑

মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো ডক্টর জুলেখা আর বনহুর। বনহুরের শরীরেও ডাক্তারের ড্রেস।

মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেবও রয়েছে তাদের সঙ্গে।

মরিয়ম বেগম বললেন—মা, মনিরা তোমার বান্ধবী ডক্টর জুলেখা এসেছে, আর এসেছে ডক্টর কাওসার।

বনহুর ডক্টর কাওসারের বেশেই আজ এসেছিলো এখানে। তার মুখেছিলো ঘন চাপ দাড়ি আর চোখে কালো চশমা। নিখুঁত ছদ্মবেশ বনহুরের তাই; তার জননীও তাকে চিনতে সক্ষম হয়নি।

ডক্টর জুলেখা মনিরার কাঁধে হাত রাখলো—মনিরা আজ তোমার চোখের পট্টি খুলে দেবো? বলো, কাকে তুমি প্রথম দেখতে চাও?

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো—যাকে দেখতে চাই তাকে তুমি কোথায় পাবে?

বলো আমি তাকে নিয়ে আসবো।

তাকে পাবে না।

আমি কথা দিচ্ছি—যাকে তুমি দেখতে চাও তাকেই তুমি প্রথম দেখতে পাবে।

বেশ, আমার স্বামীকে আমি দেখতে চাই। কিন্তু মনে রেখো, তাকে যদি না দেখতে পাই তাহলে ---না না, তাহলে আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে চাইনা। অন্ধ আছি তাই আমি ভাল আছি—জুলেখা তাই আমি ভাল আছি।

মনিরা আমার সমস্ত পরিশ্রম পন্ড করে দিও না। সরে এসো তোমার চোখের পট্টি খুলে দি। কথাটা বলে জুলেখা মনিরার চোখের পট্টি খুলতে গেলো।

মনিরা জুলেখার হাত মুঠায় চেপে ধরলো—সে আজ আসবে। তুমি অপেক্ষা করো। আমি প্রথম দৃষ্টি শক্তি লাভ করে তাকেই দেখতে চাই।

ডক্টর কাওসারের বেশে বনহুর এবার কথা বললো—মিসেস মনিরা, আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন?

মুহুর্তে মনিরার মুখমন্ডল দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। স্বামীর কণ্ঠস্বর তার অন্তরে মধু বর্ষণ করলো যেন। চোখে না দেখলেও বুঝতে পারলো সে, কণ্ঠস্বর তার স্বামীর ছাড়া আর কারো নয়।

বললো এবার মনিরা—দাও জুলেখা আমার চোখের পট্টি খুলে দাও।

জুলেখার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হলো।

মরিয়ম বেগম বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন, তিনিও আশ্বস্ত হলেন।

সরকার সাহেব খুশী ভরা চোখে তাকিয়ে আছেন আজ মনিরার চোখের পট্টি খুলে দেওয়া হবে, আবার দেখতে পাবে মনিরা—একি কম খুশীর কথা!

ততক্ষণে বাড়ীর অন্যান্য সবাই এসে দাঁড়িয়েছে কক্ষ মধ্যে।

নকীবও দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে।

ডক্টর জুলেখা মনিরার চোখের পট্টি খোলায় ব্যস্ত।

ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুর মনিরার দিকে। আজ কিছুক্ষণ পূর্বেই সে শহরে এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। তাজের কৃতিত্বেই সে এত দূরের পথ আসতে পেরেছে।

বনহুর মনিরার ঠিক সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

মরিয়ম বেগম ও সরকার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন পাশে।

জুলেখা মনিরার চোখের পট্টি খোলা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ স্থির নয়নে তাকিয়ে থেকে বললো সে—চোখ মেলো মনিরা।

মনিরা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো।

সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা লাগছে তার চোখে। কেমন ঘোলাটে সব! মনিরার চোখের সামনে একটি আলো জ্বেলে দিলো জুলেখা উজ্জ্বল আলো।

মনিরা এবার দেখলো তার সম্মুখে একটি অপরিচিত মুখ। মুখটা ওর কালো হয়ে উঠলো, অস্ফুট কণ্ঠে বললো —না না, আমি এ দৃষ্টিশক্তি চাই না। আমি এ দৃষ্টিশক্তি চাই না। আলো নিভিয়ে দাও জুলেখা আলো নিভিয়ে দাও!

জুলেখা বললো—মনিরা শান্ত হও। অমন উতলা হলে আবার অন্ধ হয়ে যাবে।

সেই ভাল ছিলাম জুলেখা সেই ভাল ছিলাম। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে কি লাভ হবে আমার? ওকে যদি না দেখতে পাই তাহলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে কি হবে বলো? মনিরা দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

জুলেখা ইংগিতে কক্ষ থেকে সকলকে বেরিয়ে যেতে বললো।

মরিয়ম বেগম ও সরকার সাহেব বেরিয়ে গেলেন। অন্যান্য সবাইও কক্ষ থেকে চলে গেলো বাইরে।

বনহুর এবার নিজের দাঁড়ি গোঁফ আর চোখের কালো চশমাটা খুলে ফেললো।

জুলেখা বললো—মনিরা চোখ তোল মনিরা।

না না, আমি চোখ তুলবো না। তোমরা যাও জুলেখা, আমাকে বিরক্ত করোনা। তোমরা যাও---

কিন্তু মনে রেখো মনিরা আবার যদি তুমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলো তাহলে নিজের ভুলের জন্য হারাবে। বেশ যেতে বলছো —যাচ্ছি---

জুলেখা পাশের একটা থামের আড়ালে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর তার মুখমন্ডলে কোন রকম ছদ্মবেশের আড়ম্বর না রেখে পাশে এসে বসলো।

মনিরা তখন হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বনহুর মনিরার চিবুক ধরে উঁচু করে তুললো, ডাকলো—মনিরা!

মনিরা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকালো, মুহূর্তে আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠলো চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো ওর। স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললো—তুমি!

আড়ালে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করলো ডক্টর জুলেখা। মুখখানা বিষন্ন মলিন হলো একটা গভীর বেদনা অনুভব করলো সে অন্তরে। ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল সকলের অজ্ঞাতে।

বনহুর আর মনিরার মিলন দৃশ্য সে কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছিলোনা। কারণ জুলেখা চরমভাবে ভালোবেসেছিলো একদিন বনহুরকে। সে ভালবাসার মধ্যে ছিলোনা কোন ছলনা। জুলেখা যদি জানতো যাকে সে এমন গভীরভাবে ভালবাসছে সে মনিরার স্বামী, তাহলে হয়তো ওর সান্নিধ্য জুলেখার হৃদয়ে এতো আলোড়ন সৃষ্টি করতো না।

সকলের অলক্ষ্যে জুলেখা বেরিয়ে এলো বাইরে।

বারান্দায় দেখা হলোসমরিয়ম বেগমের সংগে। তিনি জুলেখাকে বেরিয়ে যেতে দেখে বললেন —সে কি মা, অমন করে চলে যাচ্ছ কেনো?

মনিরার চোখ ভাল হয়ে গেছে, আমার আর কোন দরকার হবেনা, কাজেই আমি চলে যাচ্ছি।

কথাটা বলে জুলেখা দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ জুলেখার চলে যাওয়া পথের দিকে। ভাবলেন, জুলেখা চলে গেলো কিন্তু ডক্টর কওসার সাহেব তো গেলেন না।

মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হলেন, কোথায় ডক্টর কাওসার—এ যে তার সন্তান মনির।

মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করতেই বনহুর এলো মায়ের পাশে, বললো মা।

মরিয়ম বেগম হাস্য উজ্জল মুখে বললেন—তাই তো আমি চমকে উঠেছিলাম কাওসার সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনে কিন্তু সাহস হয়নি কিছু বলবার।

বনহুর বললো এবার—মা মনিরার দৃষ্টিশক্তি লাভের জন্য আমরা সবাই ডক্টর জুলেখার কাছে ঋণী।

হাঁ বাবা, আল্লার ইচ্ছা আর সে না হলে মনিরা আমার কোনদিন এ দুনিয়ার আলো দেখতে পেতোনা। কিন্তু জুলেখা হঠাৎ অমন করে চলে গেলো কেনো?

বনহুর বলে উঠলো—ডক্টর জুলেখা চলে গেছেন?

হাঁ আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে এভাবে চলে যাচ্ছে বলে, সে বললো—আমার আর দরকার হবেনা।

মনিরা বললো— আমাকে একটি কথাও না বলে চলে গেলো সে!

বনহুর আনমনা হয়ে গেলো কি যেন চিন্তা করে বললো—যেতে দাও মনিরাতাকে।

সেকি! আমার বান্ধবী আমার জন্য এতো করলো তার জন্যই আবার আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। ওগো আমি তাকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে কিছুতেই শান্তি পাব্বোনা। কেনো সে চলে গেলো আমাকে কিছু না বলে? নিশ্চয়ই সে অভিমান করেছে—জুলেখা বড় অভিমানিনী।

মরিয়ম বেগম বললেন—হাঁ মনিরা, আমার সেই রকম মনে হচ্ছে। জুলেখা কেনো যেন, অভিমান করে চলে গেছে। মনিরা তোমরা দু'জনা যাও ওকে খুশী করতে চেষ্টা করো গে।

মনিরা বললো—আমি তাই যাবো। জুলেখা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে, সে আমার কাছে যা চাইবে তাই দেবো।

মনিরা জুলেখা যা চায় দিতে পারবে? বললো বনহুর।

পারবো। আমার দৃষ্টির বিনিময়ে আমি তাকে সব দিতে রাজী আছি। তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।

মরিয়ম বেগম বললেন—মনিরা মা মনিরা ঠিক বলেছে। জুলেখাকে খুশী করতেই হবে যেমন করে হোক। ও যদি মন খারাপ করে তাতে মঙ্গল হবে না। বাবা, তুমি মনিরার কাছে বসো আমি কিছু খাবার তৈরী করে আনি, আমার বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে।

বনহুরের কথা বুঝতে পেরে মনিরা হাসলো মুখ ফিরিয়ে।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে। পুত্র এসেছে—আনন্দে আত্মহারা তিনি। বাড়ীর চাকর—বাকরদের ডাকাডাকি হাকাহাকি শুরু করলেন। সরকার সাহেবকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন মরিয়ম বেগম।

হঠাৎ মরিয়ম বেগমের এতো খুশীভরা ভাব লক্ষ্য করে বাড়ীর সবাই অবাক হলো,বিশেষ করে চাকর—বাকরের দল। কেনোনা, মরিয়ম বেগমকে তারা তেমন করে কোনদিন আনন্দ প্রকাশ করতে দেখেনি।

নিজেই উনানের পাশে এসে বসলেন, নিজের হাতে রেধে খাওয়াতে না পারলে তার যেন তৃপ্তি হচ্ছে না।

মরিয়ম বেগম চলে যেতেই বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললো—তোমার বান্ধবীকে তুমি খুশী করতে চাও কিন্তু সে যা চাইবে পারবে দিতে?

কেন পারবো না? যে আমার এতো বড় উপকার করেছে তাকে আমি আমার সর্বস্ব দিতে পারবো।

মনিরা!

হাঁ। ওগো তুমি আমায় বারণ করো না।

বেশ। কিন্তু সে তোমার কাছে যা চায় আমি জানি।

মনিরা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—সত্যি বলছো? তুমি জানো আমার বান্ধবী জুলেখা কি চায়? বলো—ওগো বলো কি চায় সে? আমার কাছে যা চাইবে তাই দেবো তাকে।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—মনিরা যত সহজ মনে করছো তত সহজ নয় দেওয়াটা।

তুমি আমাকে এতো ক্ষুদ্রমনা মনে করছো? যত টাকা সে চায় তাই দেবো। টাকা না চায় অলঙ্কার দেবো, গাড়ী চায় গাড়ী দেবো বাড়ী চায় তাই দেবো—যা চায় দেবো আমি।

হাসলো এবার বনহুর—ও সবের অভাব নেই তার। সে চায় তোমার স্বামীকে! পারবে—পারবে দিতে তুমি?

মুহুর্তে মনিরার মুখ কালো হয়ে উঠলো, বললো সে — এ তুমি কি বলছো?

সত্যি কথা বলছি। মনিরা, তোমার বান্ধবীর আশা সামান্য নয়।

না না এ হতে পারে না।

কেনো, পারবে না, একটু আগেই তুমি বলেছো জুলেখা তোর কাছে যা চাইবে তুমি দেবে তাকে?

বলেছি, কিন্তু যা সে চায় তা আমি কল্পনাও করিতে পারিনি। অসম্ভব, এ কখনও হতে পারেনা—না না, কখনই না। তার চেয়ে আমার জীবনটা চাইলেও আমি দিতে রাজি আছি—

মনিরা তোমার বান্ধবীকে আমিও সেই কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম মনিরা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে আপনি যা চাইবেন তাই আমি দেবো আপনাকে। আমিও তখন বুঝিনি— সে এমন কিছু চাইবে যা দেবার মত নয়।

মনিরা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—তারপর?

তারপর আমার কথায় সে বললো—পারবেন। পারবেন আপনি দিতে? আমি যা চাইবো? আমি বলেছিলাম, পারবো। মনিরা তোমার বান্ধবী আমার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলেছিলো, আপনার ভালবাসা আমি চাই। একান্ত নিজের করে পেতে চাই আমি আপনাকে।

তুমি কি জবাব দিলেছিলে?

বলেছিলাম—ডক্টর, আপনি যা চান—অসম্ভব। কারণ আমি বিয়ে করেছি।

সত্যি! সত্যি তুমি তাকে এ কথা বলেছো?

বলেছি।

না না, আমি এ দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে চাইনা। চাইনা আমি দুনিয়ার আলো দেখতে। সব অন্ধকার হয়ে যাক তবুও তোমাকে। আমি কারো হাতে দিতে পারবোনা। চাপা ক্রন্দনে কণ্ঠ ধরে আসে মনিরার।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে আবেগ ভরা গলায় বলে—মনিরা তুমি বিশ্বাস করো আমাকে। তুমি যখন অন্ধ ছিলে, আমি পারতাম জুলেখাকে খুশী করতে। মনে রেখো মনিরা তোমার স্বামী পিশাচ হতে পারে কিন্তু পাশবিক নয়।

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে আনন্দভরা কণ্ঠে বলে—আমি জানি এ কথা।

মনিরা তুমি আমাকে বিশ্বাস করো তাই আমার সান্ত্বনা। তাছাড়া এ পৃথিবীর কেউ আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনা বা করেনা। সবাই জানে—দস্যু বনহুর শুধু ধন—রত্ন, টাকা—কড়িই হরণ করেনা, নারীর ইজ্জত লুটে নিতেও সে দ্বিধা করেনা. কিন্তু মনিরা তারা জানেনা —দস্যু বনহুরের কাছে সবের চেয়ে নারীর মর্যাদা অনেক বেশী।

দরজায় পদশব্দ শোনা যায়।

বনহুর মনিরাকে মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে বসে।

মরিয়ম বেগম একটু কেশে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন। হাতে তার রাশিকৃত খাবার।

টেবিলে রেখে বলেন মরিয়ম বেগম—বাবা মনির, এসো খাও মনিরা তুমিও খাও ওর সঙ্গে।

হাঁ এসো মনিরা মায়ের হাতে রান্না জিনিস আমরা দু'জনা মিলে খাই।

মনিরাও উঠে—স্বামীর সঙ্গে টেবিলে এসে বসে।

মরিয়ম বেগম নিজে পরিবেশন করে খাওয়ান।

মনিরা খাচ্ছিলো স্বামীর সঙ্গে হঠাৎ মুখভাব গম্ভীর বিষন্ন হয়ে উঠে, খাবার মুখে না তুলে চুপ হয়ে থাকে সে।

বনহুর বলে —কি হলো মনিরা?

কিছু না।

তুমি খাচ্ছো না কেনো?

খেতে পারবোনা।

মরিয়ম বেগম বললেন—অসুস্থ লাগছে বুঝি?

না মামীমা।

তবে কি হলো মা মনি?

আমার নূরের কথা মনে পড়েছে। না জানি নূর কোথায়? বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে।

বনহুর এবার ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে বলে সে মনিরা নূরের জন্য তুমি ভেবোনা। নূর যেখ্খানেই থাক সে ভালই আছে।

কিন্তু আমার মন কেমন যেন অস্থির লাগছে। নূরের মুখখানা ভাসছে আমার চোখের সামনে।

মরিয়ম বেগম মনিরার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলেন—ছিঃ অতো চিন্তা করলে খারাপ হবে। তোমার নূর নিশ্চয়ই ভাল আছে। খোদা তাকে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারে না।

আমার নূর ভাল আছে—কি করে জানবো আমি?

বনহুর এবার বলে উঠে—আমি বলছি সে ভাল আছে।

এক সময় বনহুর আর মনিরার খাওয়া শেষ হয়ে যায়। মরিয়ম বেগম আজ তৃপ্তি সহকারে পুত্র এবং পুত্রবধুকে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন।

সারাটা দিন মরিয়ম বেগম ছেড়ে দিলেন না পুত্রকে। সন্ধ্যা হয়ে এলো এক সময় বনহুর যেন আজ শান্ত ছেলেটির মত চুপ হয়ে রইল। হাসি গল্প আর শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিলো দিনটা।

মরিয়ম বেগম তো এমনটিই চান। মনে মনে খোদার কাছে হাজার শুকরিয়া করেন তিনি। কত দিনের আশা তার—একমাত্র সন্তান মনিরকে

নিয়ে সুখের নীড় গড়বেন। আজ বুঝি আল্লাহতায়ালা তার আরজ কবুল করেছেন। মনিরের তাই বুঝি সুমতি হয়েছে আর সে চলে যাবে না।

মরিয়ম বেগম খেতে দিয়ে তখন বসেছিলেন—মনির, একটা কথা রাখবি বাবা?

বলো মা রাখবো।

আমার গায়ে হাত রেখে শপথ কর।

উঁহু তাহলে আমার শোনাই হোলনা তোমার কথাটা।

মরিয়ম বেগম বললেন—তোকে শুনতেই হবে মনির?

আমি তো শুনবনা বলিনি—বলেছি তোমার গা ছুয়ে শপথ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় মা।

তুই আর চলে যাবি না বাবা?

এ কথা তুমি আরও বহুবার বলেছো মা, তোমার কথা রাখতে পারিনি, কোনদিন পারবো কিনা।

বনহুরের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, মুখ মুছে উঠে দাঁড়ায়। একটু ভেবে বলে আবার—মা, আমার কি সখ হয় না তোমাদের নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তুলি। কিন্তু পারিনা—পারিনা নিশ্চিত হতে শত শত ক্ষুধার্ত ভাই—বোনদের অশ্রুসজল আঁখি আমায় পাগল করে তোলে। শুনতে পাই তাদের করুণ আর্তনাদ--মা, আমি পারিনা তখন নিজকে ধরে রাখতে। তখন আমি উন্মাদ হয়ে উঠি যত রাগ হয় আমার ধনী লোকদের উপর, যারা নিরীহ গরীবদের বুকের রক্ত শুষে নিয়ে গড়ে তুলছে স্বর্গ সমতুল্য ইমারত গড়ে তুলেছে নিজের ভবিষ্যতের কাঠামো স্বর্ণ আসনে উপবেশন করে যারা রাজভোগে ক্ষুধা নিবৃত্ত করছে তাদের উপর। দাঁতে দাঁত পিষে বনহুর চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হয়।

নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে মনিরা স্বামীর এই দীপ্তকান্তি সৌম্য সুন্দর। জ্বলন্ত মূর্তির দিকে—এ মানুষ পৃথিবীর নয় কোন দেবযুবক।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হৃদয় ভরে উঠে মনিরার। স্বার্থক তার জীবন স্বার্থক তার নারীত্ব। এমন স্বামী সে পেয়েছে।

বনহুর বলেই চলেছে—মা, আমি তখন স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার মধ্যে তখন জেগে উঠে একটা ভীষণ মানুষ। এক পৈশাচিক প্রাণ। মায়া মমতার বালাই তখন থাকেনা আমার মধ্যে। তখন আপন জনের বুকেও ছোরা বসিয়ে দিতে আমার থাকেনা কোন দ্বিধা।

মনিরা!

মা, তুমি জানোনা—তোমার সন্তান শুধু তোমার নয় সে এই পৃথিবীর সন্তান। পৃথিবী আমার মা, পৃথিবীর বুকে যারা বাস করে সবাই আমার ভাইবোন। বলো মা তুমি যদি তোমার সন্তানকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখো— তাহলে আমার চির হতভাগ্য ভাই—বোনদের বেদনার অশ্রুকে মুছে দেবে কে, কে দেবে তাদের ক্ষুধায় অন্ন।

তাইবলে তুই দস্যুতা করে---

দস্যু আমি নই মা, যাদের প্রচুর আছে তাদের কাছ থেকে আমি নিয়ে যাদের নেই তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেই। মা, তুমি আমাকে বাধা দিও না! তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, তোমার সন্তান যেন দেশ ও দেশবাসীর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে।

❑

নূরীর জীবন রক্ষার জন্যই দেশ ত্যাগ করেছে রহমান। শুধু দেশ ত্যাগই নয়, আত্মীয়—স্বজন বন্ধু—বান্ধব এমনকি তার অতি প্রিয় সর্দারকেও ত্যাগ করে চলে এসেছে সে আরাকান শহরে। কান্দাই এর মায়াও মুছে ফেলে দিয়েছে সে নিজের মন থেকে। আর কোনদিন কান্দাই শহরে ফিরে যাবে কিনা সেই আশাও করেনা।

টাঙ্গী চালায় সারাটা দিন। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে রহমান। পয়সা উপার্জন যা করে তাই দিয়ে কোন রকমে সংসার চালিয়ে নেয়। নূরী সে আর মনি—তিনটি প্রাণী কোন রকমে চলে যায়। দস্যুতা রহমান একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, মাঝেমাঝে তার অবাধ্য মন যদিও চঞ্চল হয়ে উঠে তা অতি সংযতভাবে দমিয়ে রাখে শপথ করেছে— আর সে দস্যুতা করবেনা বিশেষ করে মনির জন্য তাকে দস্যুতা ত্যাগ করতে হয়েছে। সর্দারের সন্তান মনি—তাকে মানুষ করাই এখন রহমানের কাজ। মনি লেখাপড়া শিখবে দস্যু না হয়ে হবে সে একজরন মস্ত বড় অফিসার কিংবা ঐ রকম একটা বড় কিছু। রহমান তাই মনিকে আরাকান শহরে একটা ভাল ইংলিশ স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। নূরী ওকে খাইয়ে দাইয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে

বইগুলি তুলে দেয়, তারপর ওর ছোট্ট ফুটফুটে গালে একটু মৃদু আঘাত করে বলে—যাও মনি স্কুলে যাও।

রহমান টাঙ্গীতে ঘোড়া জুড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।

মনি ছুটে আসতেই রহমান ওকে কোলে তুলে নিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে নিজেও কোচ বাক্সে উঠে বসে। বাম হস্তে মনিকে আঁকড়ে ধরে দক্ষিণ হস্তে অশ্বের লাগাম টেনে ধরে।

গাড়ী ছুটতে শুরু করে।

স্কুলের সম্মুখে টাঙ্গী দাঁড় করিয়ে মনিকে কোলে করে নামিয়ে দেয়।

যতক্ষণ মনি স্কুল—কক্ষে প্রবেশ না করে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রহমান গাড়ীর পাশে।

তারপর গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায় স্কুল—প্রাঙ্গন থেকে। দিন ভর ভাড়া খেটে ঠিক স্কুলের সময় হলেই ছুটে আসে রহমান তার ঠিক জায়গা।

মনিরের প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে রহমান তার গাড়ীর পাশে।

মনি দূর থেকে রহমানকে দেখে ছুটে আসে জড়িয়ে ধরে ওকে।

রহমান তুলে নেয় কোলে—চলো, মনি তোমার মামীর কাছে চলো।

মনি কিন্তু রহমানকে কাক্কু ডাকাতো, রহমানের কথায় মনি তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে—মাম্মীকেও একদিন নিয়ে আসবে এখানে তাই না কাক্কু?

হাঁ তোমার মাম্মীকেও আনবো।

রহমান যখন মনিকে নিয়ে তাদের ছোট্ট আবাসে এসে পৌঁছালো তখন নূরী তাদের খাবার নিয়ে প্রতিক্ষা করছে।

টাঙ্গী থেকে নেমে রহমান মনিকে নামিয়ে দিলো।

মনি ছুটে গিয়ে জাপটে ধরলো নূরীকে।

নূরী কোলে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো মনির গাল দুটো। তারপর খেতে দিলো ওদের দু'জনকে।

❑

দিন যায়।

মনির স্কুলে লেখাপড়া করে।

রহমান টাঙ্গী চালায়ে অর্থ উপার্জন করে।

নূরী রান্না করে খাওয়ায় যত্ন করে ওদের। কিন্তু সারাটা দিন তার বড় অশান্তিতে কাটে বড় একা একা মনে হয় আস্তানায় সে ছিলো মুক্ত বিহঙ্গের মত—আর এখানে এসে হয়েছে সে খাঁচার বন্দী পাখীর মত। প্রাণ খুলে কোথাও বেড়াতে পারে না, কথা কইবার কাউকে কাছে পায় না, চুপচাপ কাটাতে হয় সারাটা দিন। যতক্ষণ ফিরে না আসে রহমান আর মনি ততক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতো পথের দিকে চেয়ে।

কতদিন নির্জন কক্ষে একা একা বসে ভাবতো সে কত কথা অতীতে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলি তার মনের পর্দায় ভেসে উঠতো একটি পর একটি করে। নূরীর জীবনপাতা হাতড়ে একজনকে বার বার তার মনে পড়তো—সে তার বনহুর। অনেক চেষ্টা করেও সে একটি মুহুর্তের জন্যও ভুলতে পারতো না তাকে। বনহুর যে তার ধ্যান —জ্ঞান সাধনা —স্বপ্ন। বনহুরের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় সে।

কিন্তু আজকাল আর একটি মুখ তার মনে পড়ে বনহুরের মুখের পাশে, সে ঐ রহমান।

একটা করুণ মুখচ্ছবি তাকে অস্থির করে তোলে। মায়া হয় বেচারী রহমানের জন্য। ছোট বেলা হতেই রহমানকে সে দেখে এসেছে। রহমান তার সান্নিধ্য লাভের আশায় সব সময় লালায়িত থাকতো শিশু মনে ছিলোনা তখন কোন লালসার আভাস—অতি পবিত্র অতি সচ্ছ ভাবেই রহমান ভালবাসতো নূরীকে। কিন্তু নূরী ওকে কোন দিন করুণার চোখে দেখেনি, একটু খানি ভালবাসাতে সে পারেনি কোন দিন ওকে।

তার জন্য রহমানের কোন অভিমান ছিলোনা ছিলো শুধু বুক ভরা ব্যথা।

রহমান বনহুরকে সব সময় সম্মানের চোখে দেখতো। ছোট বেলা হতেই তাকে সে সমীহ করে চলতো। অবশ্য কারণও ছিলো অনেক। রহমান বনহুরের চেয়ে বয়সে বেশী কম না হলেও কিন্তু কম ছিলো। বুদ্ধি আর শক্তিতেও বনহুর ছিলো অসীম। রহমানকে বনহুর অনেক বার সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে ছিলো। একবার বিরাট এক অজগরের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলো সে।

বনহুর তার তরবারী দিয়ে খন্ড খন্ড করে কেটে ফেলেছিলো অজগর সাপটাকে।

আরও কয়েকবার এমনি নানা বিপদের মুখ থেকে রহমানকে রক্ষা করছে বনহুর। শুধু রহমানকেই নয়, আস্তানায় এমন জন নেই যে, বনহুরের কাছে জীবনের বিনিময়ে ঋণী নয়।

রহমান যেদিন জানতে পেরেছিলো—বনহুর নূরীকে ভালবাসে আর নূরীও ভালবাসে তাকে সেই দিন হতে রহমান নূরী থেকে দূরে সরে পড়তে চেষ্টা করেছে, যতদূর সম্ভব সরে রয়েছে তার কাছ থেকে।

কিন্তু পুরুষ মন—মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠতো। নূরীকে নিজের করে পাবার জন্য মন তার অস্থির হয়ে পড়তো কিন্তু সর্দারের কথা মনে করে নিজকে সংযত করে নিতো রহমান।

আজ সেই নূরী তার পাশে একেবারে অতি নিকটে। তবু রহমান পাথরের মূর্তির মত কঠিনভাবে নিজকে শক্ত করে রেখেছে। নূরীর সান্নিধ্য তাকে কখনও কখনও উত্তেজিত করে তোলে বটে কিন্তু নিজকে সে দাবিয়ে রাখে মন্ত্রগ্রস্থের মত। নূরীকে সে রক্ষা করতে এনেছে—গ্রাস করতে নয়।

রহমান যতই কঠিন হতে চেষ্টা করুক, যতই সে শক্ত হতে চাক কিন্তু সো তো মানুষ—তার দেহেও রক্ত মাংসের তৈরী। তার ধমনীতেও প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ রক্ত। প্রাণ তারও আছে।

একদিন নূরীর মুখখানা অস্থির করে তুললো রহমানকে। মনি তখন স্কুলে। রহমান টাঙ্গী নিয়ে ফিরে এল বাসায়।

নূরী টাঙ্গীর শব্দ পেয়ে ছুটে এলো হাতের কাজ ফেলে, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—আজ এতো সকাল সকাল এলে যে? মনি কোথায়? ওর কিছু হয়নিতো?

কেনো, সকাল সকাল কি কোনদিনই আসতে নেই নূরী?

আগে বলো মনি কোথায়?

স্কুলে।

আর তুমি তাকে না নিয়েই চলে এলে?

স্কুল ছুটির অনেক দেরী আছে কিনা তাই--

রহমান নূরীর পিছনে কক্ষে প্রবেশ করলো। মাথার পাগড়ীটা খুলে এক পাশে রেখে নূরীর খাটিয়ায় গিয়ে বসলো।

নূরীর বিস্ময় তখনও খাটেনি। কিছুটা এগিয়ে এসে বললো— হঠাৎ এলে যে?

নূরী, টাঙ্গী চালাচ্ছি, কেনো যে তোমার কথা মনে পড়ায় হৃদয়টা আমার অস্থির হয়ে পড়লো। তোমার ঐ ঢলঢল মুখখানা আমায় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকলো---

রহমানের কণ্ঠস্বর আজ স্বাভাবিক ছিলো না আবেগ ভরা গলায় সে নূরীকে বললো আবার —নূরী আর কতদিন এমনি করে কাটাবে?

রহমান, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটু স্থির হয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে নূরী।

তুমি কি বলতে চাও?

নূরী, আমি বলছি—নিজের জীবনটা এমনি করে ব্যর্থ করো না। ঐ সুন্দর স্নিগ্ধ রূপরাশি হেলায় নষ্ট করো না নূরী, হেলায় নষ্ট করো না।

রহমান!

হাঁ নূরী জানি আমি যা বলছি তা তোমার কাছে খুব খারাপ লাগছে কিন্তু তুমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবে, আমার কতাগুলো কত মূল্যবান। তোমার ফুলের মত নিষ্পাপ একটি জীবন আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবো না নূরী।

আজ তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে রহমান। তুমি কি নেশা পান করেছো?

আজতো তুমি নতুন নও নূরী। তুমি জানো, নেশা করা আমার অভ্যাস নেই, কাজেই আমি নেশাগ্রস্ত নই। নূরী, আমি অনেক চিন্তা করেছি, শুধু আজ নয়—মাসের পর মাস বছরের পর বছর আমি তোমার কথা ভেবেছি।

তার মানে?

মানে ভেবেছি তোমার ঐ অপূর্ব রূপরাশি যে কোন পুরুষের পরম কামনার বস্তু, আর সর্দার সেই অমূল্য সম্পদের কোন মর্যাদা দিলো না।

রহমান তুমি সংযতভাবে কথা বলো।

আমি অসংযত কোন কথাই বলবো না নূরী তা ছাড়া আমি জোরপূর্বক তোমাকে কোনদিন স্পর্শও করবো না। যতক্ষণ তুমি আমাকে স্বেচ্ছায় ধরা না দেবে।

নূরীর চোখ দুটো দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগলো। দাঁত পিষে বললো—সে আশা তুমি কোনদিন করো না রহমান।

তুমি কি তাহলে নিজের জীবনটা নষ্ট করে দেবে?

রহমান, তুমি তা হলে এখনও জানো না, আমি কে?

হঠাৎ হেসে উঠলো রহমান হাঃ হাঃ করে, তারপর বললো— জানি তোমার ধ্যান—জ্ঞান স্বপ্ন—সাধনা দস্যু বনহুর। কিন্তু মনে রেখো নূরী কোন দিন তাকে পাবে না—পেতে পারো না।

মুহূর্তে নূরীর মুখ কালো হয়ে উঠলো চোখ দুটো অশ্রু সিক্ত হলো। নূরী একথা জানে তবু রহমানের মুখে কথাটা তার অন্তরে যেন বিদ্ধ করলো। দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বললো নূরী—রহমান তোমার মুখে এসব কথা শোনার পূর্বে আমার মৃত্যু হওয়ার উচিৎ ছিলো। জানতাম না তুমি সুযোগ পেলেই আমাকে গ্রাস করতে চেষ্টা করবে।

না না,নূরী আমী তোমাকে গ্রাস করতে চাই না। তোমার মঙ্গলই আমার একমাত্র কামনা।

তাহলে তুমি আমাকে বার বার ঐসব কথা স্মরণ করাচ্ছো কেনো? একদিন তোমাকে বলেছি—আমি মনে-প্রাণে ওকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি কোন ঝড়—ঝঞ্ঝা বাধা—বিপত্তি আমার মনে থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারবে না, কিছুতেই না।

কিন্তু সে কি তোমায় কোনদিন স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পেরেছে? বলো পেরেছে?

জানি না!

এক হাতে যেমন কোনদিন তালি বাজে না, তেমনি স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ কোন দিন এক জনের মনের কথায় হয় না। নূরী সর্দার বিয়ে করেছে আর তার সন্তানও জন্মেছে একটা।

রহমান।

হাঁ নূরী।

বিয়ে যে করেছে জানি কিন্তু---কিন্তু তার সন্তান--না না এ হতে পারে না।

অবাক কণ্ঠে বললো রহমান—দস্যু বনহুর বিয়ে করেছে একথা তুমি জানো?

জানি। বনহুর নিজে আমাকে একথা বলেছিলো একদিন।

এ কথা জেনেও তুমি তাকে স্বামী বলে মনে নিতে পারছো?

এ কথা শোনার অনেক আগেই যে আমি তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি রহমান। মেয়েদের বিয়ে একবারই হয়। দ্বিতীয় বার যদি কোন নারী কোন পুরুষকে স্বামী বলে গ্রহণ করে তাহলে সেটা তার বিয়ে নয় লোক দেখানো

একটা ভন্ডামি মাত্র। মেয়েদের হৃদয় এমন একটা জিনিস যা একজনকেই দেওয়া যায়, দ্বিতীয় জনকে নয়।

নূরী, তাহলে কি তুমি বনহুরের ধ্যান করেই জীবন কাটিয়ে দেবে?

হাঁ, সেটাই হবে আমার জীবনের চরম সাধনা।

তার স্ত্রী—সন্তান আছে জেনেও?

নূরী নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার গন্ড বেয়ে। একটু চিন্তা করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—তার সন্তান আছে এ কথা তোমাকে কে বললো?

আছে এবং সে তোমারই কোলে---

রহমান।

নূরী, সর্দার তোমাকে কিছু দিতে পারেনি, তাই তার সন্তানকে এনে দিয়েছে তোমার বুকে।

নূরীর চোখে মুখে রাশিকৃত বিস্ময় ফুটে উঠে। অবাক কণ্ঠে বলে— তুমি কি বলছো রহমান?

যা বলছি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা?

বেশ, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেবো কিন্তু মনে রেখো নূরী তার ধ্যান করেই শুধু তোমাকে কাটাতে হবে কোনদিন তার নাগাল পাবেনা---কথাটা বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

নূরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ভেবে পেলোনা রহমান তাকে কি বুঝিয়ে বলতে চাইলো।

❑

অন্য একদিন।

মনি ঘুমিয়ে আছে, পাশে বসে জামা সেলাই করছিলো নূরী। সম্মুখে একটি পায়ার উপরে লন্ঠনটা দপ দপ করে জ্বলছে।

রহমান হাতের উপর মাথা রেখে শুয়েছিলো কি যেন ভাবছিলো সে গভীরভাবে।

নূরীর মনটাও সেদিনের পর থেকে বেশ গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। রহমানের সঙ্গে মন খুলে সে যেন কথা বলতে পারে না। সব সময় কি যেন চিন্তা করে। রান্না করে খাওয়ায় নিজে একটু মুখে দেয়—সব আগের মতই আছে শুধু তার মনে এসেছে মস্ত একটা পরিবর্তন। বনহুরের স্ত্রী আছে, সন্তান আছে---বনহুর তার নিজ সন্তানকে তুলে দিয়েছে তার বুকে--তবে কি ---তবে কি তার ধারনা সত্য। বহুদিন আগে মনিকে যেদিন প্রথম সে দেখেছিলো চমকে উঠেছিলো সে—তার হুরের চেহারার সঙ্গে মনির যে অদ্ভুত মিল দেখেছিলো। কিন্তু তা কি করে সম্ভব হবে মনিকে সে তার সম্ভুর জঙ্গলে কাপালিকের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছিলো। বনহুরই তো সেদিন উদ্ধার করেছিলো এই শিশু মনিকে। সেদিন তো নিজেই সে সঙ্গে ছিলো তার। মনি কার ছেলে তা তারা কেউই জানেনা, কিন্তু রহমান বলেছে--বনহুর তারই সন্তানকে তুলে দিয়েছে নাকি তার বুকে---সব কেমন এলোমেলো লাগে নূরীর কাছে। উঠে দাঁড়ায় সে এগিয়ে আসে রহমানের পাশে--রহমান।

কিছু বলবে নূরী?

সেদিন যে তুমি বলেছিলে হুর তার নিজের সন্তানকে আমার বুকে তুলে দিয়েছে। তুমি কি বলতে চাও—মনি হুরের সন্তান?

বলতে চাইনা নূরী বলছি সর্দারের সন্তান মনি।

অসম্ভব?

কেনো অসম্ভব?

মনিকে আমরা সম্ভুর জঙ্গলে পেয়েছি।

যেখানেই পাও তাকে মনি তারই সন্তান।

কিছুতেই হতে পারে না।

নূরী, ভাল করে তাকিয়ে দেখো দেখি--ঐ ঘুমন্ত শিশুর মুখে কার মুখের ছাপ ফুটে উঠেছে।

রহমান!

হাঁ নূরী, তুমি বিশ্বাস করো মনি দস্যু বনহুরের সন্তান এবং মনির মা চৌধুরী কন্যা মনিরা।

না না, মনি আমার সন্তান। আমি---আমি ওর মা।

সর্দার মনিকে তুলে দিয়েছে তোমার হাতে, তুমিইতো ওর মা।

কিন্তু কি করে তা হবে। ওর মা যে মনিরা—চৌধুরী কন্যা মনিরা ও গর্ভধারিনী জননী---

রহমান উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, নূরীর মুখোভাব লক্ষ্য করে বললো -মনি জানেনা সে কথা জানলেও সে কচি শিশু ভুলে গেছে অনেক দিন। সর্দার ওকে তোমার সন্তান বলেই তোমাকে সঁপে দিয়েছে---কাজেই মনি এখন তোমারই সন্তান।

যখন বড় হবে জ্ঞান হবে, তখন—তখন সে নিজের মায়ের অন্বেষণ করবে। আমার তখন কি হবে রহমান? আমি বাঁচবো কাকে নিয়ে--নূরী আকুলভাবে কেঁদে উঠলো।

রহমান রইলো নিশ্চুপ হয়ে কোন জবাব সে খুঁজে পেলোনা।

নূরী অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে আঁচলে চোখ মুছলো, তারপর সরে এলো রহমানের পাশে—রহমান, বনহুর আমাকে সব দিকে ধোকা দিয়েছে। আমাকে সে ধোকা দিয়েছে। ছোট বেলা হতে আমার মন নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলেছে। আমার ভালবাসা নিয়েছে সে নিঃশেষ করে কিন্তু আমাকে সে এতোটুকু দেয়নি। আজীবন সে আমাকে কাঁদিয়েছে, হাসতে দেয়নি কোন দিন। রহমান, আমি ভুলে যাবো, সত্যি ওকে ভুলে যাবো।

রহমান নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিলো, বললো এবার— নূরী, তুমি ভুল বুঝছো। সর্দার তোমাকে যত ভালবাসে তত তার স্ত্রীকেও বুঝি বাসে না। আমি জানি—তুমি তার জীবনের আলো—আর মনিরা রশ্মি।

এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

না করলে আমি নাচার।

রহমান আমি এবার বাঁচতে চাই। তুমি না একদিন বলেছিলে, নূরী, তোমার জীবনটা ব্যর্থ করোনা।

একদিন নয়—বহুদিন আমি তোমাকে এ কথা বলেছি। জীবন-ভর তোমাকে তার ধ্যানই করে যেতে হবে, কোন দিন তাকে পাবে না।

রহমান!

বলো?

আমি ভুলে যাবো, ভুলে যাবো ওকে। কি হবে ওর কথা ভেবে। জীবনে যে এতোটুকু দিতে পারেনি... কি হবে তার ধ্যান করে...।

রহমান নূরীর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হয়, আজ প্রথম সে নূরীর মধ্যে দেখতে পেলো এক ভিন্ন রূপ। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো নূরী আবার —আমি তোমাকে ভালবাসবো, তোমাকে আমি বিলিয়ে দেবো আমার জীবন—।

নূরী !

বহুদিন তোমাকে আমি উপেক্ষা করে বিমুখ করেছি, আজ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি রহমান। তুমি আমাকে গ্রহণ করো....

নূরী! রহমান যেন অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো।

নূরী রহমানের পায়ের কাছে নত হয়ে বসে পড়লো—রহমান, আমি তোমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করবো।

রহমান সরে দাঁড়ালো, দু'হাত বাড়িয়ে নূরীকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো—নূরী তা হয় না।

কেনো, তুমিই না আমাকে বার বার বলেছো, আমাকে তুমি চাও।

চেয়েছিলাম, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি— তোমাকে নিয়ে আমি শান্তি পাবো না। যে হৃদয় তুমি একজনকে দাদন করেছো সে হৃদয় আর একজনকে দেওয়া যায় না নূরী।

আমি মুছে ফেলবো তার স্মৃতি।

নূরী, তা হয় না। একদিন আমি তোমাকে পাওয়ার জন্য উম্মাদ হয়ে উঠেছিলাম, আজ সে আকাঙ্খা আমার নেই। নূরী, তোমাকে আমি ভালবাসি সত্য তুমি আমার শ্রদ্ধার পাত্রী।

রহমান!

হাঁ নূরী, আমি মনের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করেছি, কিন্তু জয়ী হতে পারিনি—পরাজিত হয়েছি। নূরী, তুমি আমার বোন.....।

রহমান!

বলো নূরী?

রহমান ভাই, তুমি আমাকে বাঁচালে। আমাকে তুমি বাঁচালে।

তোমার পায়ে মাথা রেখে এখন আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারবো। কোন পাপ থাকবে না তোমার আর আমার মধ্যে।

আজ রহমান আর নূরী পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমালো। উভয়ে যেন উভয়ের কাছে আজ আপন, অতি সরল-সহজ হয়ে এসেছে। সম্বন্ধ ছিলো বন্ধু—আজ হলো ভাই।

কতদিন বুঝি এমন আরামে ওরা ঘুমাতে পারেনি। রহমানের মনে সদা জেগেছে এক না পাওয়ার উন্মত্ত বাসনা আর নূরীর মনে দানা বেঁধেছে একটি অজানিত আশঙ্কা। আজ আর কারো মনে নেই কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা কোন অহেতুক স্পন্দন।

❑

মনিকে নিয়ে বেশ কাটছিলো নূরী আর রহমানের। আজকাল নূরী রহমানকে রহমান ভাই ডাকে।

মনিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে রহমান সারাদিন টাক্সী চালায় আর নূরী বাড়ীতে সংসারের কাজ করে। ফিরবার পথে রহমান মনিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে।

নূরী রান্নাবান্না শেষ করে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রতিক্ষা করে রহমান ভাই আর মনির।

প্রতি দিনের মত আজও নূরী সংসারের কাজ সেরে দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলো পথের দিকে। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ যেন কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে ওদের ফিরতে। উদ্বিগ্ন অন্তর নিয়ে প্রতিক্ষা করছে সে।

এমন সময় একটি অন্ধ ভিখারী এগিয়ে এলো নূরীর সম্মুখে। এক মুঠ্ঠি ভাত দিজিয়ে মাই। থোরা পানি...

নূরীর মনটা কেঁদে উঠলো বৃদ্ধ ভিখারীর করুণ কণ্ঠস্বরে। বললো—একটু দাঁড়াও বাবা, তোমার জন্য খাবার আনছি।

বৃদ্ধ ভিখারীর মুখটা খুশীতে ভরে উঠলো, বললো আবার— মাই অপেক্ষা বহুৎ দয়া।

নূরী চলে যেতেই ভিখারী মুখের মধ্যে দুটো আংগুল দিয়ে এক রকম শব্দ করলো, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন গুণ্ডা ধরণের লোক আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে এসে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ ভিখারী তার দলবলকে কি যেন ইংগিৎ করে আবার লাঠিতে ভর করে উবু হয়ে দাঁড়ালো।

আসলে ভিখারী বৃদ্ধ নয়, সে আরাকান শহরের সেরা ডাকাত ভোলানাথ জীর সহকারী শ্যামনাথ।

শ্যামনাথ একদিন এ পথে যাবার সময় নূরীকে দরজায় দেখেছিলো, তারপর সে নূরীর সৌন্দর্যের কথা গিয়ে বলেছিলো তাদের দলপতি ভোলানাথজীকে।

ভোলানাথ যেমন ছিলো দুর্দান্ত শয়তান তেমনি ছিলো তার নারী পিপাসা। শহরের যে কোন মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করাই ছিলো, তার কাজ।

ডাকাত ভোলানাথের ভয়ে শহরের মেয়েরা শান্তিতে বাস করতে পারতো না।

সহকারী শ্যামনাথ নূরীর নিকটে এসেছে এক মুটি অন্নের জন্য।

নূরী নিঃসঙ্কোচে খাবার নিয়ে বেরিয়ে এলো উঠান থেকে।

বৃদ্ধ ভিখারীর বেশে শ্যামনাথ বললো মাই আপ আয়া?

হাঁ বাবাজী' খাবার এনেছি, নাও। নূরী খাবারের থালাটা এগিয়ে ধরলো ভিখারীর সম্মুখে।

বৃদ্ধ ভিখারীর মাটিতে থালা রেখে বললো—আপ্ দিজিয়ে মাই। খোদা আপকো বহুৎ ভালা করে.......

নূরী যেমন ভিখারীর থালায় ভাত-তরকারী ঢেলে দিতে গেলো অমনি ভিখারী মুখের মধ্যে দুটো আংগুল পুরে শিষ দিয়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক বেরিয়ে নূরীকে ধরে ফেললো। কেউবা নূরীর মুখে কাপড় গুঁড়ে দিলো।

অদূরে একটু আড়ালে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়েছিলো, বলিষ্ঠ লোকগুলি নূরীকে এটে ধরে গাড়ীখানার মধ্যে তুলে ফেললো। শয়তান লোকগুলিও উঠে পড়লো গাড়ীতে।

ড্রাইভার এজন্য প্রস্তুত ছিলো, নূরীকে গাড়ীতে তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টার্ট দিলো সে। উল্কা বেগে গাড়ীখানা ছুটতে শুরু করলো।

নূরীকে এমনভাবে গাড়ীর মেঝে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে বাইরে থেকে কিছু বুঝতে না পারে কেউ।

জনমুখর রাজপথ ছেড়ে উল্টো পথে, গাড়ী ছুটতে লাগলো। গাড়ীতে উঠিয়ে নেওয়ার পর পরই নূরীর নাকে ঔষধ ধরে অজ্ঞান করে ফেলা হয়েছে, কাজেই নূরী গাড়ীর মধ্যে মৃত্যুর ন্যায় পড়ে আছে।

যে পথ দিয়ে নূরী সহ ভোলানাথের অনুচরগণ এগিয়ে যাচ্ছিলো সেই পথেই টাঙ্গী চালিয়ে মনি সহ আসছিলো রহমান।

গাড়ীখানা রহমানের টাঙ্গীর পাশ কেটে চলে গেলো। এক হল্কা ধুলো ছড়িয়ে পড়লো রহমান আর মনির চোখে মুখে।

গাড়ীখানার দিকে রাগতভাবে একবার তাকালো রহমান কারণ গাড়ীখানার দ্রুত গতি তার কাছে বেশ অসন্তুষ্টজনক বলে মনে হলো।

মনি বললো—রহমান কাক্কু, তুমি ওদের গাড়ী রুখতে পারলে না? আর একটু হলে আমাদের গাড়ী উল্টে দিয়ে চলে যেতো। হাঁ মনি ঠিক বলেছো, বড্ড বেয়ারাভাবে গাড়ী চালাচ্ছে ওরা। আমাদের গাড়ীখানা ধার করে না নিলে ঠিক উল্টে যেতো।

আমি হলে কি করতাম জানো?

কি করতে মনি?

টাঙ্গী থেকে লাফিয়ে পড়তাম ওদের গাড়ীতে তারপর ড্রাইভার ছোকরাকে দেখিয়ে দিতাম কেমন করে গাড়ী চালাতে হয়।

মনির কথায় রহমানের বুক ভরে উঠে সর্দারের ছেলে—ঠিক কথাও বলেছে সর্দারের মত। পিঠ চাপড়ে দেয় রহমান—সাবাস মনি, বড় হয়ে তুমি ওদের গাড়ী চালানো শিখিয়ে দিও।

রহমান আর মনি টাঙ্গী নিয়ে বাড়ী এসে পৌঁছলো। প্রতি দিনের মত আজ নূরীকে দরজায় না দেখে রহমান একটু আশ্চর্য হলো।

মনিকে টাঙ্গী থেকে নামিয়ে দিয়ে বইগুলি হাতে দিলো রহমান—যাও মনি; তোমার মাম্মীর কাছে যাও। তোমার মাম্মী বোধ হয় ভিতরে আছে।

মনি বই-পুস্তক হাতে ছুটলো বাড়ীর ভিতরে।

প্রথমে ঘরে প্রবেশ করে মনি থমকে দাঁড়ালো' কই—কোথায় তার মাম্মী। এবার সে ডাকতে লাগলো উচ্চকণ্ঠে—মাম্মী! মাম্মী!

কোথাও থেকে কোন সাড়া এলো না।

মনি এখানে-ওখানে সবখানে ছুটোছুটি করে খুঁজলো। কোথাও নূরীকে না পেয়ে মনি ফিরে এলো রহমানের পাশে।

রহমান তখন টাঙ্গী থেকে অশ্ব দুটো খুলে বেঁধে রাখছিলো। মনি রহমানের সম্মুখে এসে কাঁদো কাঁদো সুরে বললো—কাক্কু, মাম্মী নেই।

অবাক হয়ে বলে উঠলো রহমান—মাম্মী নেই?

না, কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না। মাম্মী নেই....

রহমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে মনিকে নিয়ে উঠানে প্রবেশ করে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো—নূরী—নূরী—নূরী...

প্রতিধ্বনি ফিরে এলো নূরীর কোন শব্দ এলো না।

রহমান আবার উঠানের প্রতিটি জায়গা খুঁটি খুঁটি করে খুঁজলো। রান্নাঘরের ভিতরে এদিক সেদিক দেখলো, আবার বেরিয়ে এলো বাইরে। হঠাৎ রহমানের নজর পড়লো—বাইরে দরজার পাশে পড়ে আছে একটি থালা, আর কিছুটা ভাত-তরকারীও পড়ে রয়েছে থালাটার পাশে।

রহমান কিছুক্ষণ স্থির নয়নে তাকিয়ে রইলো থালাটার দিকে, বুঝতে পারলো—নূরী কোন ভিখারীকে খাবার দিতে এসেছিলো সেইক্ষণে তাকে কোন শয়তান লোক পাকড়াও করে নিয়ে গেছে।

রহমান মনিকে কিছু না বলে কোলে তুলে নিয়ে বললো— চলো মনি, তুমি খাবে চলো।

মনি মুখ ভার করে বললো—মাম্মী কোথায় আগে বলো, তবে খাবো।

মাম্মী! মাম্মী আছে।

কোথায় আমার মাম্মী?

বললাম তো। রহমান ব্যাপারটা অনুমান করে নিলেও চট্ করে মনিকে বলতে পারলো না, কারণ মনি কচি শিশু—হঠাৎ এমন কোন কথা তাকে বলা উচিৎ হবে না যা তার সরল মনে আঘাত করে, তাই রহমান বললো—হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছে—আসবে এক্ষুণি।

মাম্মীর কাছে যাবো আমি। মাম্মীর কাছে যাবো.... কান্না জুড়ে দিলো মনি।

রহমান অতিকষ্টে নিজকে সংযত রেখে মনিকে প্রবোধ দিতে লাগলো। কিন্তু মনির কান্না যেন থামতে চায় না।

রহমান ফাঁপড়ে পড়লো যেন : এদিকে নূরীর চিন্তা, কোথায় গেলো সে? নিশ্চয়ই তাকে জোরপূর্বক কেউ পাকড়াও করে নিয়ে গেছে। মাথাটা যেন রহমানের বন বন করে ঘুরছে—এখন উপায়? কি করবে কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছে না সে।

মনি না থাকলে এক মুহূর্ত বিলম্ব করতো না, এক্ষুণি বেরুয়ে পড়তো নূরীর সন্ধানে। কিন্তু এখন সে মনিকে নিয়ে মহা বিপদে পড়ে গেছে। ছোট কচি শিশু—তাকে একা ফেলে কোথাও যাওয়া যায়না। তাই বলে নূরীর

সন্ধান না করে উপায় নেই। রহমান অধর দংশন করে—কে সে নরাধম যে নূরীকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

মনির কোন রকমে চারটি খাইয়ে পাশের বাড়ীর চাচীর কাছে তাকে রেখে রহমান টাঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। হঠাৎ রহমানের মনে পড়লো, ফেরার পথে একখানা টাক্সি অতি দ্রুত তাদের টাঙ্গীর পাশ কেটে চলে গিয়েছিল, ঘটনাটা অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে হলো তার।

রহমান সেই পথে টাঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল, কারণ পথটা বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর কয়েকটা পথের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। কোন পথে গিয়েছে গাড়ীখানা কে জানে।

রহমান টাঙ্গী থামিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো, অকুল সমুদ্রে যেন কোন কুল খুঁজে পাচ্ছে না। টাঙ্গীর উপর বসে সে তাকাচ্ছে প্রত্যেকটা পথের দিকে, তার মন যেন ডেকে বলছে—যে গাড়ীখানা তখন উল্কা গতিতে চলে গিয়েছে ঐ গাড়ীখানার মধ্যেই ছিলো নূরী। রহমান নিপুণ দৃষ্টি মেলে পথের দিকে তাকাচ্ছিলো, হঠাৎ নজরে পড়ে গেলো—অদূরে পথের মুখে পড়ে আছে একটা ঝক্‌ঝকে মত জিনিস।

রহমান টাঙ্গী থেকে এক রকম প্রায় লাফিয়ে নেমে পড়লো। দ্রুত গিয়ে জিনিসটা তুলে নিলো হাতে, সঙ্গে সঙ্গে রহমানের চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠলো, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর ছুটে গিয়ে উঠে বসলো টাঙ্গীতে।

অশ্বের লাগাম টেনে ধরতেই টাঙ্গীখানা উল্কা গতিতে ছুটতে শুরু করলো।

যে পথের মুখে চক্‌চকে জিনিসটা রহমান কুড়িয়ে পেলো সেই পথে গাড়ী নিয়ে ছুটলো সে।

চক্‌চকে জিনিসটা রহমানকে পথের নির্দেশ বলে দিয়েছে। জিনিসটা অন্য কিছু নয়—নূরীর হাতের স্বর্ণবলয়। দুর্বৃত্তগণ নূরীকে যখন পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন তার সে তার হাতের বলয়টা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো গাড়ীর বাইরে।

সেই বলয়টাই হঠাৎ রহমানের নজরে পড়ে গিয়েছিলো, বলয়টা পকেটে রেখে টাঙ্গী নিয়ে ছুটলো সে।

যদিও এ পথে রহমান কোন দিন আসেনি বা এ পথ তার পরিচিত নয় তবুও টাঙ্গী নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলো।

অজানা অচেনা পথ।

পথের দুই পাশে শাল আর পাইন গাছ এক একটা প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে শাঝে ঝোপ-ঝাড় আর বন্য গাছপালাও দেখা যায়। আশেপাশে কোন বাড়ীঘর বা দালানকোঠার চিহ্ন নেই। এসব পথ বড় নির্জন, কচিৎ কোন পথচারী বিশেষ প্রয়োজনেই এই পথে এসে থাকে।

রহমানের টাঙ্গী তীরবেগে ছুটছে।

রহমান লক্ষ্য করলো—পথের ধূলায় কোন মোটরের চাকার দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আবার একটা ক্ষীণরেখা তার মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেলো।

নির্জন নিস্তব্ধ পথ বেয়ে রহমানের টাঙ্গী ছুটে চলেছে। রহমানের শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ভিজে চুপসে উঠেছে তার জামাটা। পকেটে গুলী ভরা পিস্তল। একটা তীর ধনুও নিয়েছে সে সঙ্গে, আর নিয়েছে একটা লাঠি।

রহমান বাম হস্তে অশ্বের লাগাম টেনে ধরে দক্ষিণ হস্তে পকেটে পিস্তলের অস্তিত্বটি অনুভব করে নিলো।

পথের যেন শেষ নেই!

রহমানের টাঙ্গী অত্যন্ত দ্রুত ছুটেও যেন পথ শেষ করতে পারছে না।

প্রায় প্রহর দুই চলার পরও রহমান এ পথে কোন জন-প্রাণীর সাক্ষাৎ পেলোনা। পথের ধারে শাল আর পাইন বৃক্ষগুলির ছায়া পথ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পথটা দূর হতে দূরান্তে মিশে গেছে যেন কোন অজানার বুকে। রহমান সেই পথ ধরে এগুতে লাগলো।

বেলা খুব ছিলোনা, কাজেই অন্ধকার হয়ে এলো অল্পক্ষণের মধ্যেই।

রহমান এতোক্ষণ একটানা গাড়ী চালিয়ে চলেছিলো, এবার টাঙ্গী থামিয়ে পথে নেমে দাঁড়ালো। সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো চারিদিকে। কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রহমানের দৃষ্টি যতদূর গেলো ততদূর শুধু ঝোপ-ঝাড় আর আগাছা। কোন কোন জায়গায় পাথরের স্তূপ জমে রয়েছে—ছোট ছোট পাহাড়ের আকারে।

রহমান চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছিলো। এবার সে তাকালো পথের দিকে। এখানে পথটা শুধু পাথর কেটে তৈরী—তাই পথে কোন দাগ পরিলক্ষিত হচ্ছিলনা। তাছাড়াও সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ জমাট বেঁধে উঠছিলো, এই মুহূর্তে রহমান একটু বেশী চিন্তায় পড়লো, কোন্‌দিকে অগ্রসর হবে? সম্মুখে না পাশের কোন জঙ্গলে?

রহমান ভাবছে, ঠিক সেই সময় দূরে পথের বাঁকে দুটো আলোর বল দেখা গেলো। অজগরের চোখের মত জ্বলছে যেন আলোর বল দুটো। রহমান আরও লক্ষ্য করলো, আলোর বল দুটো দ্রুত গতিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই যে এখানে এসে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন উপায়? আলোর বল দুটো কোন গাড়ীর সার্চলাইট বুঝতে বাকী নেই তার।

এবার রহমান বেশ চঞ্চল হয়ে পড়লো। গাড়ীখানা কোন সৎ ব্যক্তির না হয়ে যদি অসৎ ব্যক্তির হয় এবং তাকে দেখে কোন রকম দুষ্ট মতলবের সৃষ্টি করে। রহমান তাড়াতাড়ি তার গাড়ী থেকে, অশ্বটা খুলে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বেধে রাখলো এবার টাঙ্গীখানাকেও লুকোতে হবে।

রহমান টাঙ্গীখানা টেনে নিয়ে চললো। অতি কষ্টে তার টাঙ্গীখানা অল্প সময়ের মধ্যে পথের উপর থেকে সরিয়ে নিলো।

এমন সময় একখানা ট্যাক্সি গাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্মুখের পথ দিয়ে তীরবেগে চলে গেলো।

রহমান অবাক হয়ে দেখলো, যদিও সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলোনা কিছু, তবু বেশ বুঝতে পারলো বৈকালে যে গাড়ীখানা তার টাঙ্গীর পাশ কেটে তীব্র গতিতে ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়েছিলো—এটা সেই গাড়ী। তবে কি নূরীকে কোথাও বন্দী করে রেখে গাড়ীখানা ফিরে গেলো। নিশ্চয়ই তাই হবে—এটা যে ঐ গাড়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গাড়ীখানা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতেই রহমান তার টাঙ্গী নিয়ে পথে এসে দাঁড়ালো, ক্ষিপ্র হস্তে তার অশ্ব দুলকিকে জুড়ে দিলো টাঙ্গীর সঙ্গে।

রহমান টাঙ্গীতে উঠে বসতেই দুল্কী ছুটতে শুরু করলো। টাঙ্গীতে কোন আলো না থাকায় পথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না। রহমান পথ স্পষ্ট দেখতে না পেলেও, দুল্‌কী পশু— সে অন্ধকারেও বেশ দেখতে পায় কাজেই রহমান শুধু লাগাম টেনে ধরে বসে রইলো।

দুল্‌কী আপন মনে ছুটে চলেছে।

আজ ভাগ্যিস রহমান তার এক ঘোড়ার টাঙ্গীখানা নিয়ে বেরিয়েছিলো নইলে সে মাঝে মাঝে তার দুইটি অশ্বওয়ালা টাঙ্গী ব্যবহার করতো।

দুল্‌কী প্রভুর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলো কাজেই সে আপন মনে সম্মুখপথে দ্রুত অগ্রসর হলো।

রহমান আর দুল্‌কী দুটি মাত্র প্রাণী—যদিও উভয়ে উভয়ে মনের কথা অনুভব করছে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু কেউ কাউকে স্পষ্টভাবে জানাতে পারছেনা তাদের অন্তরের কথা।

বেশ কিছুক্ষণ দুল্‌কী অবিরাম ছোটার পর হঠাৎ এক স্থানে এসে থেমে পড়লো।

এখন কোনদিকে দৃষ্টি এগুচ্ছেনা রহমানের, কারণ চারিদিক জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এমনকি তার নিজের শরীরের কোন অংশও তার নজরে পড়ছিলোনা।

রহমান কিছু বুঝতে না পেরে দুল্‌কীর পিঠে চাবুক দিয়ে মৃদু আঘাত করলো। কিন্তু আশ্চর্য—দুল্‌কী আর এক পাও এগুলোনা। অগত্যা রহমান টাঙ্গী থেকে নেমে পড়লো রাস্তার বুকে।

রহমান লক্ষ্য করলো—দুল্‌কী সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছে, কিছু যেন বোঝাতে চেষ্টা করছে সে রহমানকে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ' মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসছে শিয়ালের হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, আওয়াজ। এখন পথের আশেপাশে কিছুই তার নজরে পড়ছিলোনা। গাছপালাগুলোকে কেমন ঝাপসা এক একটা দৈত্যের মত মনে হচ্ছিলো। এখন কি করা যায় ভাবে রহমান।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো; রহমান বুঝতে পারলো—টাঙ্গী সমেত চলা হয়তো দুল্‌কীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। রহমান দুল্‌কীর টাঙ্গী থেকে খুলে নিলো, তারপর দুল্‌কীর পিঠে চেপে বসলো সে।

আশ্চর্য হলো এবার রহমান—দুল্‌কী যেন এটাই চাচ্ছিলো অন্ধকার হলেও দুল্‌কী আনন্দে চিঁহি চিঁহি শব্দ করে উঠলো, তারপর ছুটতে শুরু করলো দ্রুতগতিতে।

রহমান যেন এবার নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো, দুল্‌কী তখন আপন মনে ছুটতে শুরু করছে।

অল্পক্ষণেই রহমান অবাক হলো, দুলকী সোজা পথে না গিয়ে পথ ছেড়ে নেমে পড়লো পথের দক্ষিণ পাশে। এবার দুলকী যেন বিপুল উদ্যমে ছুটছে।

রহমান অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছে—দুলকী যে পথে ছুটে চলেছে সেটা কোন মেঠোপথ। দুলকীর খুড়ের শব্দে অনুভব করে নিলো রহমান।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে অবিরাম গতিতে ছুটার পর দুলকীর গতি কমে এলো বলে মনে হলো রহমানের। চারিদিকে ঘন অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও সম্মুখে কেমন যেন জমাট অন্ধকার বলে ঠেকলো।

রহমান এবার ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো দুলকী তাকে কোথায় নিয়ে এলো সেই জানে। রাতের অন্ধকার না হলে সব দেখতে পেতো, কিন্তু এখন সে কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা আর্ত চীৎকারের শব্দ ভেসে এলো তার কানে। শব্দটা অত্যন্ত ক্ষীণ—অস্পষ্ট।

রহমান দুলকীর লাগাম চেপে ধরে কান পেতে শুনলো কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলো না শব্দটা কোন্ দিক থেকে এলো।

দুলকীও যেন আনচান করছে, সতর্কভাবে মাথাটা ফেরাচ্ছে এদিকে সেদিকে।

রহমান এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা, কোন দিকে যাবে। করুণ আর্তচীৎকার নূরীর কিনা তাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। চীৎকার একটা মাত্র ভেসে উঠে থেমে গিয়েছিলো, আচমকা একটা প্রতিধ্বনির মত। কোন দিকে দৃষ্টি এগুচ্ছিলোনা রহমানের, তবু সে সতর্কভাবে তাকিয়েছিলো দূরে অন্ধকারে।

দুলকীও কেমন যেন আনচান করছে, মাঝে মাঝে একটা শব্দ বের হচ্ছিলো তার মুখ দিয়ে।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা আলো দেখা গেলো দূরে—অনেক দূরে। আলোটা মিট মিট করে জ্বলছে যেন মনে হলো কিন্তু আসলে আলোটা মিটমিটে নয়, কোন মশালের আলো—বেশ বুঝতে পারলো রহমান।

এবার রহমান কালবিলম্ব না করে দুলকীর পিঠে লাফ দিয়ে উঠে বসলো, তারপর আলোর ক্ষীণ ছটা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করলো।

সোজা পথ নয়—ঝাপ-ঝাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দুলকী ছুটছে। রহমানের প্রিয় অশ্ব দুলকী বনহুরের তাজের চেয়ে তার বুদ্ধি খুব কম নয়। তাজ যেমন প্রভুর মনের কথা বুঝতো বা বোঝে তেমনি দুলকিও বুঝতে তার মালিক রহমানের মনের কথা।

পশু হলেও তাজ এবং দুলকীর বুদ্ধি বা জ্ঞান ছিলো মানুষেরই মত প্রভুর ইংগিত বুঝতে পারতো এই অশ্ব দুটি।

রহমান যে ঐ আলোর নিকটে পৌঁছতে চায়, এ কথা যেন বুঝতে পেরেছিলো দুলকী, তাই সে আলো লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটছে।

ক্রমে আলোর বিন্দুটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রহমানের চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, এবার নিশ্চয়ই নূরীর কোন সন্ধান পাবে সে।

এতোক্ষণ যে আরো লক্ষ্য করে রহমান দুলকীকে চালনা করছিলো, এতোক্ষণে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেলো—সে আলো অন্য কিছু নয়, একটা জ্বলন্ত মশাল।

রহমান এবার দুলকী সহ থেমে পড়লো, তার নিকট হতে প্রায় কয়েক গজ দূরে মশালটা দপ দপ করে জ্বলছে, দেখলো সে।

মশালটা গোঁজা রয়েছে একটা ডালের সঙ্গে, পাশে নজর পড়তেই চমকে উঠলো রহমান, কতকগুলো ভয়ঙ্কর ধরনের লোক এক জায়গায় গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে মদপান করছে আর জড়িতভাবে আবোল তাবোল কি সব কথাবার্তা বলছে।

রহমান তার অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো, তারপর অশ্বটিকে একটা গাছের গুড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলো।

এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রহমান ওদের সব কথাবার্তা।

জড়িত কণ্ঠে একটা লোক বললো—আমার ভাইগণ, যত পারো খেয়ে নাও, একটু পরে মালিক এসে পড়বে আর হবেনা।

আর একজন বললো—মলিকের আসতে এখনও ঢের বাঁকী। ইচ্ছা মত পান করে নাও দোস্ত।

মশালের আলোতে সব দেখতে পাচ্ছিল আর তাদের কথাবার্তাগুলো সব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো রহমান। বুঝতে পারলো—এটা কোন শয়তান লোকদের আস্তানা হবে। দুষ্কৃতিকারীগণ তাদের শয়তানীর জন্য এই নির্জন বনভূমিটাই বেছে নিয়েছে। রহমান স্তব্ধ নিশ্বাসে লোকগুলির কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো।

মশালটা তখনও দপ দপ করে জ্বলছে।

ঝোপ-জঙ্গলে আত্মগোপন করে প্রতিক্ষা করছে রহমান। মশা আর পিঁপড়ের কামড়ে গা জ্বালা করছে তবু একটুও শব্দ করছেনা সে। কারণ তাকে জানতে হবে—নূরী এখানে আছে কি না।

লোকগুলো বোতলের পর বোতল নিঃশেষ করে চললো—হাসছে, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, ফিস ফিস করে গানের কলি আওড়াচ্ছে।

হঠাৎ চমকে উঠলো রহমান—ভারী বুটের শব্দ শোনা গেলো সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা টর্চের আলোও যেন এগিয়ে আসছে এদিকে।

রহমান নিজকে আরও গোপনে লুকিয়ে ফেললো, দুলকীর জন্য চিন্তা—কোনক্রমে যদি ওদের নজরে পড়ে যায় তাহলে বিভ্রাট ঘটবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অল্পক্ষণ পর রহমান কতকটা আস্বস্ত হলো, টর্চের আলো আর ভারী বুটের শব্দ ওপথে না গিয়ে সোজা মশালের আলো লক্ষ করে এগুতে লাগলো।

এবার রহমান বুঝতে পারলো—এখানে মশালটা জ্বালিয়ে রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য মশালের আলোটা পথের নির্দেশ বলে দিচ্ছে।

টর্চের আলো আর ভারী বুটের শব্দ মশালের আরো লক্ষ করেই যে এগুচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হঠাৎ একটা হুইসেলের শব্দ জেগে উঠলো সেখানে।

রহমান অবাক হয়ে দেখলো—এতোক্ষণ যে লোকগুলি বোতলের পর বোতল মদপান করছিলো তারা সবাই কেমন যেন তটস্থ হয়ে উঠেছে। বোতলগুলি ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এমনিতেই তাদের চেহারা বিদঘুটে আর ভয়ঙ্কর, তারপর মদের নেশায় চোখগুলো সব জবাফুলের মত লালে লাল হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের কোমরের বেল্টে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা ও রিভলভার ঝুলছে।

লোকগুলোর মুখোভাব দেখে রহমান বুঝতে পারলো—এমন কেউ আসছে, যার ভয়ে এরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

রহমানের অনুমান মিথ্যা নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন অদ্ভুত পোশাক পরা লোক এসে দাঁড়ালো পূর্বের লোকগুলির সামনে।

রহমান তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লক্ষ্য করলো—যে লোকগুলি এখন এলো তারা সংখ্যায় পাঁচজন। আরও আশ্চর্য হলো রহমান তাদের পোশাক দেখে, প্রত্যেকেরই দেহে একই রকম ড্রেস। গাঢ় সবুজ কোট-প্যান্ট-সার্ট—এমন কি তাদের গলার টাইটা পর্যন্ত সবুজ। সকলের পায়েই ভারী বুট। বাম হস্ত কোটের পকেটে, দক্ষিণ হস্তে টর্চ।

সবুজ পোশাক পরিহিত লোকগুলি এসে দাঁড়াতেই পূর্বের লোকগুলি সেলুট করে দাঁড়ালো। অবশ্য অদ্ভুত ভংগিতে সেলুট করলো ওরা। দক্ষিণ পা উঁচু করে আর দক্ষিণ বাজু মাথায় ঠেকিয়ে একটা শব্দ করলো।

পরমুহূর্তেই একটা শব্দ হলো রহমান বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখলো—সবুজ পোশাক পরা একজন লোক হঠাৎ কোটের পকেট থেকে বাম হস্তখানা টেনে বের করলো, হস্তে তার জমকালো রিভালভার, কোন রকমে দ্বিধা না করে পূর্বের লোকগুলির এক জনের বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো।

লোকটি তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো ভূতলে।

রহমান ভেবে পেলোনা কি অপরাধ হয়েছিলো লোকটার। কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, সে নিজেও দস্যু কিন্তু এমন তো সে কোন দিন দেখে নি। রহমানের পাষাণ হৃদয়টাও অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠলো।

সবুজ পোশাক পরিহিত পাঁচ ব্যক্তির একজন কি যেন বললো। তারপর সবাই অগ্রসর হলো, পূর্বের লোকগুলিও অনুসরণ করলো ওদের পাঁচ জনকে। শেষ ব্যক্তি গাছের ডালে গোঁজা মশালটা তুলে নিলো হাতে।

পিছনে পড়ে রইলো রক্তমাখা মৃতদেহটা।

সবাই চলে গেলো, একবার ফিরেও তাকালো না কেউ মৃত দেহটার দিকে।

যে স্থানে এতোক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলো সেই স্থান হতে কয়েক গজ দূরে কালো মত কিছু দেখা গেলো মশালের আলোর ছটায়। ঠিক বোঝা না গেলেও রহমান অনুমান করে নিলো—সেটা পাহাড় বা ঐ ধরণের বিরাট একটা পাথরের স্তূপ ছাড়া কিছু না।

রহমান ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে কিছুটা সরে এলো। বনভূমি রাতের জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলো তাই তাকে কেউ ওরা দেখতে পেলোনা গাছের গুড়ির আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে রহমান এই অদ্ভুত লোকগুলির কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো।

মশালের আলোতে সব স্পষ্ট দেখা না গেলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে সব। সর্বপ্রথম সবুজ পোষাক পরিহিত লোকগুলি পাহাড়টির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো, পিছনে অন্যান্য লোকগুলি।

রহমান অবাক হয়ে দেখলো—পাহাড়টা হঠাৎ যেন ধীরে ধীরে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণে আরও আশ্চর্য হলো—লোকগুলি সব ঐ পাহাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হলো।

রহমানের চোখের সম্মুখে এবার সব অন্ধকার হয়ে এলো। এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা সে, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার রহমান এবার কি করবে, কোথায় যাবে, ভাবতে লাগলো। একটু পূর্বে দুর্বৃত্ত শয়তান লোকগুলির হৃদয়হীনতার যে চাক্ষুষ প্রমাণ সে পেয়েছে তাতে বুঝতে পেরেছে লোকগুলি শুধু ভয়ঙ্করই নয়, সাংঘাতিক অমানুষ! রহমান ভোরের আশায় অপেক্ষা করবে না দুল্‌কী নিয়ে ফিরে যাবে শহরে, ভাবতে লাগলো। নূরী যে এখানেই আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

❑

স্বামীর বাহুবন্ধনে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে মনিরা বেহেস্তের সুখ অনুভব করে, অনাবিল আনন্দে আপ্লুত হয় তার হৃদয়। পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন আজ মনিরার অন্তরে দানা বেঁধে উঠেছে। এমন করে স্বামীকে সে কোনদিন পায়নি। মুদিত আঁখিদ্বয়, ঠোঁটের কোণে মৃদু মধুর হাসি, দক্ষিণ হস্তে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে আছে মনিরা!

আকাশে চাঁদ হাসছে।

জোছনায় পৃথিবী ঝলমল করছে!

ফোয়ারার পানিতে চাঁদের আলো স্বপ্নপুরীর মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করে চলেছে।

বাগানবাড়ীর মধ্যে সান বাঁধানো সোফায় বসে ছিলো ওরা দু'জনায়—দস্যু বনহুর আর মনিরা। তাদের সম্মুখেই ফোয়ারার পানিগুলো ঝিরঝির করে পড়ছে। মৃদুমন্দা বাতাস অজানা ফুলের সুরভী নিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে সে দিকে।

কত রকম ফুল ফুটে আছে বাগানে। কত অজানা ফুলের সমারোহ।

বনহুর মনিরার মুদিত আঁখি দুটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠে—অপূর্ব!

মনিরা শান্ত মধুর কণ্ঠে বলে—চাঁদের আলো না ফুলের সুবাস?

বনহুর মনিরার চিবুকে মৃদু চাপ দিয়ে বলে—তোমার মুখ। সত্যিই মনিরা, তোমার মুখের দিকে তাকালে আমি ভুলে যাই আমার অস্তিত্ব।

তবুও আমি তোমাকে ধরে রাখতে পারিনা, সেই আমার দুঃখ।

মনিরা, তুমি অবুঝের মত কথা বলো, আমি তো সব সময় তোমার পাশেই আছি। যখনই তুমি আমাকে স্মরণ করো তখনই তো আমি ছুটে আসি তোমার কাছে।

তবুও আমার তৃপ্তি হয়না, আমার মনে চায় সব সময় তোমাকে ঘরে রাখি আমার অন্তরের অন্তস্থলে....

মনিরা।

হাঁ, আমি তোমাকে সব সময় কাছে পেলে আর কিছু চাইনা। সমস্ত দুনিয়ার পরিবর্তে আমি তোমাকে কামনা করি। জানোনা—নারীর স্বামীই যে সর্বস্ব।

মনিরা, আমারও কি ইচ্ছা হয়না সব সময় তোমাকে এমনি করে বেঁধে রাখি বাহুবন্ধনে? কিন্তু কি করবো বলো—আমি যে পারিনা আমার অসহায় ভাই-বোনদের ছেড়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

তাহলে তুমি তাদের নিয়েই থাকো। অভিমান ভরে স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে সরে বসে মনিরা।

বনহুর ব্যথাকরুণ কণ্ঠে বলে উঠে—ছিঃ তুমি তো অবুঝ নও মনিরা। তোমার জ্ঞান-গরিমা অন্যান্য যে কোন নারীর চেয়ে অনেক—অনেক বেশী। মনিরা, তুমি শুধু নারী নও—তুমি দস্যু বনহুরের সহধর্মিণী। তোমার হৃদয় হবে যেমন কোমল তেমনি পাষাণের চেয়েও শক্ত। ব্যথিতের বেদনায় তোমার অন্তর গলে যাবে কিন্তু জালিমের জুলুমের বিরুদ্ধে তুমি হবে রণরঙ্গিনী।

তুমি যা চাও তাই হবো, তাইহবো..... মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গোজে।

সত্যি মনিরা?

হাঁ তুমি যা চাও আমি তাই করবো।

মনিরা।

বলো?

আজকের এই মধুময় সন্ধ্যায় তোমার বীণার সুর শুনবার জন্য মনটা আমার আকুল বিকুল করছে। শোনাবে মনিরা?

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করাই যে আমার জীবনের ব্রত।

মনিরা।

তুমি একটুখানি বসো, আমি বীণা নিয়ে আসি।

উঁহু, ছেড়ে দেবোনা তোমাকে।

তাহলে?

তাহলে গান শোনাও।

উঁহুঁ।

গাও মনিরা।

মনিরা বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে ছুটে পালায়।

মনিরার হাসির শব্দ শোনা যায় ওদিকে গোলাপ ঝাড়ের পাশে।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে মনিরার চলে যাওয়ার পথের দিকে।

মনিরা চলে গেলো।

বনহুর পায়চারী করছে ধীর মন্থর গতিতে।

ফুরফুরে হাওয়ার বনহুরের চুলগুলি উড়ছে। আজ তার শরীরে ধপধপে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবী। মনিরা বনহুরকে নিজের হাতে আজ সাজিয়ে পরিয়ে দিয়েছে। এখন বনহুরকে দেখলে কে বলবে সে দস্যু ব ডাকু। অপূর্ব অদ্ভুত সুন্দর একটি যুবক সে।

মনিরার প্রতিক্ষার অপেক্ষা না করে বনহুর তামাসা করার জন্য লুকিয়ে পড়লো পাশের হাস্নাহেনার ঝাড়ের আড়ালে। হাটু গেড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো মনিরার।

অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলো মনিরা, হাতে তার বীণা। স্বামীকে না দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলো সে। উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগলো এদিকে ওদিকে। কোথাও ওকে খুঁজে না পেয়ে বিষন্ন মনে বসে পড়লো পাথরাসনে। ভাবতে লাগলো—তবে কি সে চলে গেছে। এমনি আরও কতদিন এসেছে—আবার ধুমকেতুর মত চলে গেছে—যাবার সময় তাকে একটি কথাও বলে যায় নি। মনিরার হৃদয় গুমড়ে কেঁদে উঠে, আজও মনিরা স্বামীকে চিনতে পারে নি। সময় সময় ওর মনে হয়, তার মত সুখী এ দুনিয়ায় আর বুঝি কেউ নয়, আবার কখনও অন্তরটা ওর গুঁমড়ে কেঁদে উঠে—তার মত অসহায় নারী আর

কোথাও নেই। যাকে সে চায়, জীবন দিয়ে যাকে সে কামনা করে, সে যে তার বাধ্য নয়.....

মনিরা যখন স্বামীর চিন্তায় ব্যস্ত তখন বনহুর হাস্নাহেনার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো, আলগোছে চেপে ধরলো মনিরার চোখ দুটো।

স্বামীর হাতের পরশ মনিরার শিরায় শিরায় আলোড়ন জাগায়! মুহূর্তে ওর অন্তর থেকে দূর হয়ে যায় বিষন্নতার ছাপ। মুখমণ্ডল উজ্জল দীপ্ত হয়ে উঠে, স্বামীর হাতের উপর হাত রেখে বলে—দুষ্ট!

বনহুর মনিরার চোখ দুটো মুক্ত করে দিয়ে বসে পড়লো পাশে। শান্ত-সুমিষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠেছে তার ঠোঁঠের ফাঁকে।

মনিরা গম্ভীর গলায় বললো—আমাকে ভাবিয়ে তুমি আনন্দ পাও, তাইনা?

মিছামিছি কেনো তুমি ভাবো বলো তো? আমি কি কচি শিশু, তাই হারিয়ে যাবো?

শিশু তুমি নও কিন্তু তোমাকে যে আমি প্রতি মুহুর্তে হারাই। কিছুতেই পারি না আমি তোমাকে ধরে রাখতে। ওগো, চিরদিন শুধু দূরে দূরেই থাকবে, কোন দিন কি তোমায় নিশ্চিন্ত মনে পাবো না?

আমি তো তোমারই মনিরা।

তবু তোমাকে যেন প্রাণভরে পাই না, সব সময় ভয়—কখন আবার হারিয়ে যাবে....

ও তোমার মনের দুর্বলতা মনিরা। যাক, এবার শুরু করো—তোমার বীণার ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠুক এই জোছনা ভরা রাত।

মনিরা বীণাখানা কোলের উপর তুলে নিলো।

অপূর্ব ঝঙ্কার উঠলো মনিরার বীণাতে।

বনহুর নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

দখিনা বাতাস ফুলের সুরভী নিয়ে জানায় তাদের সাদর সম্ভাষণ।

বীণার ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠে বাগানবাড়ীর আকাশ বাতাস।

বীণার সুর এক সময় থেমে যায়।

বনহুর ওকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে।

এক খণ্ড মেঘ তখন চাঁদকে আড়াল করে দাঁড়ায়।

ঠিক সেই মুহুর্তে একটা শিষ দেবার শব্দ শোনা যায়।

চমকে উঠে বনহুর, মনিরাকে মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে বসে, মুখোভাব গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার।

মনিরা বলে—কিসের শব্দ ওটা?

বনহুর চিন্তিত কণ্ঠে বললো—রহমানের ইংগিতপূর্ণ শিষ দেবার শব্দ ওটা। তবে কি রহমান ফিরে এসেছে? শেষের কথাটা মনেই বলে উঠলো বনহুর।

আবার ঐ রকম শব্দ শোনা গেলো, ঠিক্ বাগনের পিছন থেকে শব্দটা আসছে বলে মনে হলো তাদের।

বনহুর আর বিলম্ব না করে মনিরাকে বললো—তুমি একটু অপেক্ষা করো মনিরা, আমি আসছি।

বনহুর চলে গেলো।

মনিরার বুকের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করেছে, একটা আশঙ্কা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। বনহুর চলে গেলেই মনিরা আড়ালে এসে দাঁড়ালো, জোছনার আলোতে স্পষ্ট দেখলো—বনহুরের প্রধান অনুচর রহমানই বটে—মাথায় পাগড়ী, শরীরে খাকী পোষাক—ঠিক্ দারওয়ানের ড্রেস পরে আজ সে এসেছে।

বনহুরের দেহে রহমান কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো, কোন কথা প্রথমে বলতে পারলো না সে।

বনহুর গম্ভীর-কঠিন কণ্ঠে বললো এবার—কোথায় ডুব মেরেছিলে?

সর্দার!

জানো তোমার অপরাধ কত গুরুতর?

জানি সর্দার।

জেনেও তুমি আমার সম্মুখে আসতে পারলে? তোমার সাহস মন্দ নয় দেখছি।

সর্দার, না এসে উপায় নেই। বড় বিপদে পড়ে আপনার নিকট এসেছি। সর্দার আমি পারলামনা.....

রহমানের কণ্ঠ বাষ্প রুদ্ধ হয়ে এলো।

বনহুর গর্জে উঠলো— নেকামি ছেড়ে আসল কথা বলো।

সর্দার নূরীকে দুর্বৃত্তগণ হরণ করে নিয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো, কঠিন কণ্ঠে বললো—আর তুমি কি করলে?

অমাবস্যায় নূরীকে ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে আমি দু' সপ্তাহ কাল ধরে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছি। সর্দার, ভেবেছিলাম আমি নূরীকে শয়তান দুরাচারগণের হাত থেকে উদ্ধার করবো কিন্তু সক্ষম হলাম না।

তাই এসেছো আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে?

হাঁ সর্দার।

রহমান, তুমি আমার বিশ্বস্ত অনুচর না হলে এতোক্ষণ তোমার প্রাণবায়ু হাওয়ায় মিশে যেতো। একটু থেমে আবার বললো—যাকে নিয়ে আত্মগোপন করতে পারলে, তাকে হেফাযতে রাখবার মত সামর্থ হলো না? যাও আমি তোমাকে সাহায্য করতে অক্ষম।

সর্দার! রহমান দুহাত জুড়ে বিনীতভাবে বললো।

আড়ালে দাঁড়িয়ে মনিরা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো, কারণ নূরীকে ভালভাবেই জানে মনিরা। নূরী যে দস্যু বনহুরের বাল্য সহচরী এবং নূরী যে বনহুরকে ভালবাসে, সে কথা মনিরার অজ্ঞাত নয়। রহমান যে মুহূর্তে নূরীর হরণ কথাটা উচ্চারণ করেছিলো তখন মনিরার মনে কে যেন হাতুড়ির আঘাত করলো এর চেয়ে যদি রহমান বনহুরের গ্রেপ্তার সংবাদ বহন করে আনতো তবু এতোখানি চিন্তি হতোনা। মনিরা সব সহ্য করতে পারে কিন্তু নূরীর নাম সে সহ্য করতে পারেনা। তারপর কোন দুর্বৃত্তের সঙ্গে তার স্বামীকে মোকাবেলা করতে হবে, কোথায় কেমনভাবে দিন কাটবে তার, কত বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তাই বা কে জানে.... মনিরা স্বামীর অমঙ্গল চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।

রুদ্বনিশ্বাসে বনহুর আর রহমানের কথাবার্তা শুনতে লাগলো মনিরা। বুকের মধ্যে তার তোলপাড় শুরু হয়েছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণা তাকে দগ্ধিভূত করে চললো। একটু পূর্বেই মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বেহেস্তের সুখ অনুভব করছিলো। জোছনা ভরা রাতটা তার কাছে স্বপ্নময় মনে হচ্ছিলো আর এখন সব যেন অসহ্য লাগছে। রহমানের কথাগুলো তার কানে যেন গরম সীসা ঢেলে দিচ্ছিলো। কেনো, রহমান পারেনা নূরীকে উদ্ধার করতে? তার স্বামীকে কেনো সে এ সংবাদ জানাতে এসেছে? মনিরা যখন এসব ভাবছে তখন পুনরায় তার কানে ভেসে এলো রহমানের করুণ ব্যথাভরা কণ্ঠস্বর, রহমান বলছে—সর্দার, নূরীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই আমি আপনার বিনা অনুমতিতে তাকে নিয়ে পালিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ অবধি তাকে বাঁচাতে পারলামনা... বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো

রহমানের কণ্ঠ। একটু থেমে আবার বললো সে—সর্দার নূরী এখন যে অবস্থায় আছে তাতে মৃত্যু তার সুনিশ্চিত। সর্দার দয়া করুন .... রহমান। বনহুরের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়লো।

বনহুর দাতে অধর দংশন করে বললো —যা সালামতে পারবেনা কোন্ ভরসায় তাকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলে?

সর্দার, বিশ্বাস করুন আমি নূরীকে আত্মসাৎ করতে চাইনি কোনদিন। তাকে ভালবাসতাম কিন্তু সে আমাকে কোনদিন ভালবাসতে পারেনি, আমি জোর করে তার ভালবাসা গ্রহণ করতে চাইনা সর্দার, আমি তাকে বোনের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছি।

রহামন!

হাঁ সর্দার।

মনি কেমন আছে?

মনি ভাল আছে। তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি।

বনহুর এবার কি যেন ভাবলো তারপর বললো—তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি মনিরার কাছে বিদায় নিয়ে আসি।

বনহুর কথাটা উচ্চারণ করতেই মনিরা ছুটে গিয়ে ঠিক পূর্বের সেই পাথরাসনে গিয়ে বসে পড়লো। মুখভাব প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করেও সে পারলো না। চোখ দুটো কেমন বার বার ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো।

বনহুর মনিরার পাশে এসে দাঁড়ালো, তার মুখাভাবও সচ্ছ নয়। মনিরাকে নতমুখে বসে থাকতে দেখে বললো—মনিরা।

মনিরা কোন জবাব দিলো না।

বনহুর মনিরার চিবুক ধরে উঁচু করে তুললো—একি, তুমি কাঁদছো! আশ্চর্য হলো বনহুর।

মনিরা তবু নীরব।

বনহুর মনিরার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, ওর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো—মনিরা, কি হলো তোমার?

কিছু হয়নি। কথাটা বলে স্বামীর হাতখানা সজোরে সরিয়ে দিলো মনিরা।

কিছু হয়নি তবে চোখে অশ্রু কেনো? আর হঠাৎ তোমার মুখভাব এতো গম্ভীর কেনো?

জানি না।

মনিরা বলো?

না না আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, যাও তোমার নূরীকে উদ্ধার করে আনোগে।

মনিরা তুমি....

হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি। তোমার আর রহমানের সব কথা শুনেছি! ছিঃ তুমি না বলেছো—নূরী তোমার কেউ নয়।

আজও বলছি—তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই..... তাহলে মনি কে

মনি!

হ্যাঁ, যাকে রহমান স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে, যার সংবাদ জানার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়েছিলে—বলো কে মনি?

মনি! মনি...... মনির কথা বলছো? মনি.....

কেনো, বলতে বাঁধছে বুঝি?

না, বাঁধছে নয় মনি নূরীর সন্তান।

কি বললে, নূরীর সন্তান মনি

হ্যাঁ,

কিন্তু সে নাকি আজও অবিবাহিতা, তবে কি করে তার সন্তান হলো?

বনহুর হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলোনা, মাথা নত করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

মনিরা দুই হাতে চেপে ধরলো বনহুরের বুকের কাছে জামার খানিকটা অংশ—বলতে হবে মনির সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক?

মনিরা।

বুঝতে পেরেছি তুমি কত বড় জঘন্য..... মনিরা বনহুরের জামার আস্তিন ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

বনহুরের সময় অল্প এদিকে মনিরার মনে সন্দেহের দোলা ওদিকে রহমান দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। বেশীক্ষণ বিলম্ব করতে পারছেনা আর বনহুর। মনিরার ভুল ভাঙ্গানো চট করে সম্ভব নয়। বনহুর তবু বোঝাতে চেষ্টা করলো, মনিরার হাত খানা চেপে ধরলো—মনিরা আমাকে তুমি অবিশ্বাস করোনা। একদিন সব তোমাকে বলবো। আজকে তুমি আমায় খুশি মনে বিদায় দাও।

মনিরা নিশ্চুপ—পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে সে।

বনহুর মনিরার চিবুক ধরে উঁচু করে নিজের হাতে তার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বললো—তুমি বিদায় না দিলে আমার অশুভ যাত্রা হবে মনিরা! তুমি কি তোমার স্বামীর অমঙ্গল চাও?

মনিরা একবার বনহুরের মুখে তাকিয়ে আবার দৃষ্টি নত করে নিলো।

বনহুর বললো—মনি শুধু নূরীরই সন্তান নয়, তোমারও সন্তান সে।

চাইনা আমি পরের সন্তানকে নিজের করে নিতে। বলো মনি তোমার সন্তান কিনা?

হাঁ, মনি আমার সন্তান।

উঃ এও শুনতে হলো। না না, আমি চাইনা তোমাকে, তুমি চলে যাও, আমি আর তোমাকে চাইনা। যাও, যাও তুমি—তোমার অপেক্ষায় তোমার নূরী আর মনি প্রহর গুণছে..... কথা শেষ করে দ্রুত চলে যায় মনিরা অন্তপুরে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর সে ফিরে যায় রহমানের পাশে।

রহমান দুলকী আর তাজকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

বনহুর তাজের পিঠে উঠে বসতেই উলকা বেগে ছুটতে শুরু করলো।

রহমান অনুসরণ করলো সর্দারকে।

বনহুর আরাকান রওয়ানা দেবার পূর্বে একবার আস্তানায় যাওয়াই সমীচীন মনে করলো। কারণ আরাকানে শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করতে হলে তাকে সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে।

❑

হাত-পা মজবুত দড়ি দিয়ে বাধা, চুলগুলো এলোমেলো, পরিধের বসন ছিন্ন-ভিন্ন ললাটের এক পাশে কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ভূতলে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছে নূরী।

সম্মুখে শঙ্কর মাছের চাবুক হস্তে দণ্ডায়মান ডাকু ভোলানাথ। দুই পাশে তার পাঁচজন বিশ্বস্ত অনুচর বা সহকারী; সকলেরই দেহে গাঢ় সবুজ রং-এর পোশাক। এই পাঁচ ব্যক্তি ভোলানাথের দক্ষিণ হস্ত—যেমন এদের চেহারা তেমনি নিষ্ঠুর কঠিন ওরা।

ভোলানাথ কটমট করে তাকাচ্ছে নূরীর ভূলুণ্ঠিত দেহটার দিকে, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

সবুজ পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদের একজন রিভলভার উদ্যত করে বললো— দেওজী, হুকুম করুন, এক গুলীতে শেষ করে দি?

আর একজন বললো—বাগে যখন আসছেনা তখন আর রেখে কি হবে?

অন্য একজন বললো—দেওজী, ওকে চাবুক মেরে শেষ করে ফেলুন।

ভোলানাথ মেঘের মত গর্জন করে উঠলো—এতো সহজে শেষ করবার বান্দা ভোলানাথ নয়। ভাল কথায় রাজি হয়নি, এবার শক্ত কথায় বাগে আনতে হবে। তারপর তাতেও না হয়, শঙ্কর মাছের চাবুকের আঘাত চামড়া ছিড়ে লবণ মাখিয়ে তবু রাজি করাবো। যেমন করে হোক ওকে আমার চাই..... সঙ্গে সঙ্গে সপাং করে চাবুকটা এসে পড়ে নূরীর পিঠে।

নূরী আর্তনাদ করে উঠলো—উঃ উঃ আঃ আঃ....

শঙ্কর মাছের চাবুকের আঘাতে নূরীর পিঠের চামড়া কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে, জামার খানিকটা অংশ চাবুকের সঙ্গে ছিঁড়ে চলে আসে। নূরী লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে।

আবার আঘাত করে ভোলানাথ।

নূরী আর্তনাদ করে উঠে—উঃ আঃ আঃ উঃ.....

ভেলানাথ এবার ইংগিত করে তার সহকারী সবুজ পোশাক পরিহিত লোকগুলিকে।

লোকগুলি নূরীকে টানতে টানতে বের করে নিয়ে যায়।

ভোলানাথ আসন গ্রহণ করে।

অল্পক্ষণ পর ফিরে আসে সবুজ পোষাক পরিহিত লোক পাঁচজন। ভোলানাথের আসনের দুই পাশে বসে পড়লো ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে একদল নর্তকী এসে নাচতে শুরু করলো। সবাই প্রায় সমবয়সী যুবতি। তাদের শরীরে পোষাক বলতে সামান্য। অর্দ্ধ উলঙ্গ যুবতীগুলি নানা ভঙ্গীমায় নাচতে শুরু করলো।

একজন যুবতী একটা থালার সারাব পাত্র নিয়ে হাজির হলো ভোলানাথের সম্মুখে।

নাচের তালে তালে সারাব পান করে কুৎসিত হাসি হাসতে লাগলো ভোলানাথ ও তার সহকারীগণ।

নাচ শেষ হলো।

ভোলানাথ একটা নর্তকীকে ধরে ফেললো খপ্ করে। ভোলানাথের সহকারীগণ একজন নর্তকীকে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো।

ঠিক্ সেই মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে গেঁথে গেলো ভোলানাথের সম্মুখস্থ্ আসনের গায়ে।

চমকে উঠলো ভোলানাথ!

নর্তকীটিকে মুক্ত করে দিয়ে ছোরাখানা তুলে নিলো হাতে; সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের সহকারীগণ তাদের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধা নর্তকীগণকে মুক্ত করে দিল।

ভোলানাথের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠেছে। হাতের ইংগিতে নর্তকীগণকে বেরিয়ে যেতে বললো সে।

নর্তকীগণ বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

ভোলানাথ ছোরাখানা হাতে নিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললো— যেখানে মাছি প্রবেশ করতে সক্ষম হয়না সেখানে এ ছোরা প্রবেশ করলো কিভাবে?

অন্যান্য সকলে বলে উঠলো—তাই তো, এ ছোরা এলো কোথা থেকে?

সবাই ছোরাখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো।

ভোলানাথ একটা ঘন্টাধ্বনি করলো, সঙ্গে সঙ্গে অগণিত ডাকু সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

ভোলানাথ ছোরাখানা উঁচু করে ধরে বললো—আমার গুপ্ত আস্তানায় এই ছোরাখানা কিভাবে এলো শীগ্‌গীর তার সন্ধান নাও। যাও.....

যেমন সারিবদ্ধভাবে ডাকুর দল কক্ষে প্রবেশ করেছিলো তেমনিভাবে বেরিয়ে গেলো তারা।

ভোলানাথ ছোরাখানার দিকে তাকিয়ে বললো—দেখেছো শ্যাম, ছোরাখানা সাধারণ নয়।

শ্যাম নামীয় লোকটা বললো—হাঁ দেওজী, ও ছোরা কোন সাধারণ লোকের নয়।

আর একজন বলে—ছোরার বাট খাঁটি সোনার তৈরী বলে মনে হচ্ছে।

অন্য জন বললো মনে হচ্ছে নয়, খাঁটি সোনার তৈরী এটা।

ভোলানাথ ছোরাখানা সজোরে টেবিলে নিক্ষেপ করে বললো— বাজে কথা রেখে এখন ছোরা নিক্ষেপকারীকে আবিষ্কার করো। এক মুহূর্ত বিলম্ব হওয়া আর উচিৎ নয়।

ভোলানাথের সহকারীগণ উদ্যত রিভলভার হস্তে দ্রুত কক্ষে ত্যাগ করলো।

ভোলানাথ পায়চারী করতে লাগলো।

❑

রহমান মনিকে কোলে করে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

মনি বনহুরকে দেখবামাত্র আনন্দ-ধ্বনি করে উঠলো—বাপি!

বনহুর মনিকে কোলে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমু এঁকে দিলো ওর গালে, তারপর বললো বাপি তুমি কেমন আছো—?

আমি খু—ব ভালো আছি, কিন্তু মাম্মীর জন্য আমার খুব কষ্ট লাগছে। বাপি, মাম্মী কোথায় বলো না।

মাম্মী আছে।

কোথায়?

বেড়াতে গেছে মনি, আবার আসবে।

বেড়াতে গেছে তবে আসছে না কেন?

আসবে, আসবে মনি.... বনহুরের কণ্ঠে ধরে আসে।

রহমান বনহুরের কোল থেকে মনিকে নিয়ে বলে যাও বাবা, বাইরে যাও তোমার বাপি বিশ্রাম করবে।

মনি বনহুরের কোল থেকে এসে মুখ ভার করে ফেললো—মাম্মী চলে গেছে, আবার বাপিও চলে যাবে। আমি যাবো না।

বনহুর মনির চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে বলে—না না, আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না মনি।

সত্যি বলছো বাপি?

হাঁ! বনহুর কথাটা বলে আনমনা হয়ে গেলো—এতোটকু ছোট্ট শিশুকে এতো বড় মিথ্যা বলাটা তার মুখে এলো কি করে! সত্যি কি সে চিরদিনের জন্য মনির পাশে থাকতে পারবে? না, কিছুতেই এ সম্ভব নয়। সে দস্যু-ডাকু, আর মনি একটা নিষ্পাপ ফুলের মত শিশু; তার সান্নিধ্য মনিকে কোনদিন মানুষ করে গড়ে তুলবেনা। মনি মানুষ হবে—এই তার কামনা..... না না, আর মনিকে মায়ার জালে জড়াবে না সে। মনির সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে সরে থাকবে। যদি ওকে কোনদিন দেখবার ইচ্ছা হয়, দূর থেকে দেখে যাবে তবু আর মনির সম্মুখে আসবে না।

মনি বনহুরের দক্ষিণ হাত চেপে ধরে বলে—বাপি, আমি খেলতে গেলে আবার পালিয়ে যাবে না-তো?

বনহুর কোন কথা বললো না বা বলতে পারলো না।

রহমান বললো—মনি, তুমি খেলতে যাও, আমি বলছি তোমার বাপি তোমাকে ছেড়ে আর পালাবে না।

মনি একবার রহমান আর একবার বনহুরের মুখে তাকিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বললো এবার—রহমান, অতোটুকু শিশুর কাছে এতো বড় মিথ্যা বলাটা কি ঠিক হলো?

সর্দার, তাছাড়া যে আর কোন উপায় ছিলো না। সত্যি বলতে কি সর্দার, আপনার সন্তান আপনার চেয়ে বুদ্ধি-জ্ঞানে কিছু কম নয়। অতোটুকু শিশু হলেও সে মস্তবড় জ্ঞানী....

রহমান, আমি চাই না সে আমার মত দুষ্কৃতি জন হয়। আমি চাই মনি মানুষের মত মানুষ হবে। রহমান—তুমি ওকে মানুষ করে গড়ে তুলবে, সেটাই আমার ইচ্ছা।

সর্দার আপনার ইচ্ছা যেন পূর্ণ করতে পারি।

কিছুক্ষণ বনহুর আর রহমান উভয়েই নীরব রইলো। বনহুর আসনে উপবেশন করে একটা সিগারেট অগ্নি সংযোগ করলো।

রহমান বললো এবার—সর্দার, আপনি কি নূরীর সন্ধান পেয়েছেন?

শুধু নূরীর সন্ধান নয়, শয়তান ভোলানাথ ডাকুর গুপ্ত আস্তানার সন্ধানও আমি পেয়েছি।

সর্দার।

হাঁ রহমান, তাছাড়াও আমি ভোলানাথকে আমার উপস্থিতি জানিয়ে দিয়ে এসেছি!

সর্দার, এটা কি ভালো হয়েছে? ওরা সতর্ক হয়ে নেবে এবং নিজেদের সব সময় প্রস্তুত রাখবে।

রহমান অজ্ঞাতসারে কাউকে আক্রমণ করা আমার স্বভাব নয়। আমি চাই তাদের সজাগ রেখে কাজ করতে।

নূরী কেমন আছে সর্দার?

বড় মর্ম্মস্পর্শী অবস্থায় আছে।

আপনি তাকে দেখেছেন সর্দার?

হাঁ, তার অতি নিকটেই ছিলাম।

সর্দার।

তবু তাকে উদ্ধার করিনি কেনো এই তো?

জানি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই সমীচীন। সর্দার, আমি এতোদিন চেষ্টা করেও কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারিনি আর আপনি মাত্র এই কয়েক দিনের মধ্যেই শয়তানদের গুপ্ত আস্তানায় প্রবেশে সক্ষম হয়েছেন!

কিন্তু তোমার সাহায্যেই আমাকে এতোদূর অগ্রসর হতে সক্ষম করেছে। রহমান, আরাকানে পৌঁছে আর একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি যা আমার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত করেছে।

আমি বুঝতে পেরেছি সর্দার। আরাকানের এ অবস্থার জন্য দায়ী এক জাতের মানুষ, যারা, জানোয়ারের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

রহমান, আমি সেই জানোয়ারদের টুটি ছিড়ি রক্ত শুষে নেবো।

সর্দার আপনার মর্জি। আমি জানতাম, এ শহরটা বৈচিত্রময় কিন্তু পর পরই জানতে পেরেছি—শুধু শহরটাই বৈচিত্রময় নয়, এখানের মানুষগুলো আরও অদ্ভূত। এখানের গরীবদের জীবনের কোন দাম নেই পথের কুকুরের মতই নিকৃষ্ট ওরা। সারাদিন পরিশ্রম করেও কেউ তদের উচিৎ মূল্য পায়না। পায় তারা তিরস্কার আর লাঞ্ছনা—মুজুরির পরিবর্তে পায় বেত্রাঘাত। আমি আজ কয়েক মাস এ শহরে আছি—মর্মে মর্মে উপভোগ করেছি এ দেশের মানুষের হৃদয়হীন অত্যাচার।

বনহুর সিগারেট থেকে একমুখ ধুয়া নির্গত করে বললো—হুঁ।

এবার রহমান বললো—সর্দার, কিছু মুখে দিন।

হাঁ, চলো এই বেলা কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। যাও রহমান, মনিকে ডেকে নিয়ে এসো, একসঙ্গে খাবো।

রহমান বেরিয়ে গেলো, অল্পক্ষণ পরে মনি সহ ফিরে এলো।

বনহুর মনিকে টেনে নিলো কোলের মধ্যে, আদর করে বললো—বাপি চলো, খাবার খাবে চলো।

মনি খুশী হয়ে বললো—চলো বাপি।

খাবার টেবিলে বসে খেতে বললো মনি—বাপি, মাম্মী তো আজও এলোনা। কোথায় গেছে আমার মাম্মী বলো না বাপি?

বনহুর সবেমাত্র খাবার মুখে তুলতে যাচ্ছিলো মনির কথায় হাত-খানা মাঝপথে থেমে যায়, একটা ব্যথা-বেদনাভরা ভাব ফুটে উঠে বনহুরের মুখে।

রহমান বলে উঠে—ছিঃ মনি, খাবার খেতে বসে কথা বলতে নেই। খাও।

আগে বলো কাক্কু মাম্মী কোথায়? মাম্মীর জন্য মনটা বড় কেমন করছে।

বনহুর মনিকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বললো তোমার মাম্মীকে আনতে যাচ্ছি মনি।

সত্যি? খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠে মনি।

বনহুর মনির মুখে খাবার তুলে দেয়—তাহলে তুমি খেয়ে নাও কেমন।

মনি খেতে শুরু করলো।

রহমান বললো সর্দার আপনি একটু মুখে দিন।

বনহুর নিজেও খেতে আরম্ভ করলো।

মজবুত দড়ির বাঁধন নূরীর হাত-পায়ে কেটে বসে গেছে। শঙ্কর মাছের চাবুকের আঘাতে পিঠের চামড়া কেটে ঘা হয়ে গেছে। চুলগুলো জটার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তবু নূরীকে ভোলানাথ বাগে আনতে পারেনি। নূরী কঠিন পাথরের মূর্তির মতই ধীর-স্থির নিশ্চুপ। জীবন দেবে সে তবু ইজ্জৎ হারাবে না।

নূরীকে প্রতিদিন ভোলানাথ স্বয়ং তার প্রিয় সহচরগণ সহ নির্ম্মমভাবে কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকে। শঙ্কর মাছের চাবুকের আঘাতে জর্জ্জরিত করে থাকে।

তারপর অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বন্দি করে রাখে অন্ধকার কারাকক্ষে। সারাদিন পর সামান্য পানি আর শুকনো রুটী খেতে দেয় নূরীকে।

দিন দিন নূরীর দেহ ক্ষীণ হয়ে গেছে। শঙ্কর মাছের লেজের চাবুকের আঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তবুও নূরী ভোলানাথের কথায় সম্মতি দেয়না।

পরদিন আবার নূরীকে ভোলানাথের অনুচরগণ তার গুপ্ত কক্ষে নিয়ে এলো। আবার চললো তার উপর নির্মম আঘাতের পর আঘাত।

ভোলানাথ আজ হিংস্র মূর্তি ধারণ করেছে, চোখ দুটো তার আগুনের গোলার মত জ্বলছে। নিশ্বাস দ্রুত বইছে। দাঁতগুলি যেন জানোয়ারের মত বেরিয়ে এসেছে ঠোঁটের উপর। কঠিন কণ্ঠে বললো—বল, আমার কথায় রাজি হয়েছিস কিনা?

না না.... নূরী তীব্র কণ্ঠে বললো।

সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের হাতের চাবুক সপাং করে পড়লে নূরীর পিঠে। নূরী যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফেললো, তার গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এলো—উঃ। তারপর বললো সে—আমাকে মেরে ফেলো তবু আমি রাজি নই।

কি বললি! দেওজীর মুখের উপর একথা বলতে পারলি শয়তানী কথাটা উচ্চারণ করলো ভোলানাথের সবুজ পোশাক পরিহিত অনুচরগণের একজন।

আর একজন বললো—দেওজী, হুকুম করুন খতম করে দি?

ভোলানাথ রক্তচক্ষু গোলাকার করে বললো—আমি ওকে এই শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে খতম করবো কথাটা বলে চাবুক দিয়ে পুনরায় আঘাত করতে গেলো সে নূরীকে।

চাবুক দিয়ে নূরীর শরীরে আঘাত করবার পূর্বেই কে যেন তার হস্তস্থিত চাবুকটা এটে ধরে ফেললো। ফিরে তাকাবার আগেই চাবুক ভোলানাথ দেওজীর হস্তচ্যুত হলো। আশ্চর্য হয়ে দেখলো ভোলানাথ—তার পিছনে দাঁড়িয়ে একটি জমকালো পোশাক পরিহিত লোক।

সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের সবুজ পোশাক পরিহিত অনুচরগণ রিভলভার উদ্যত করলো। কিন্তু গুলী ছুড়বার অবসর তারা পেলো না। জমকালো-পোশাক পরিহিত ব্যক্তির চাবুকের আঘাতে তাদের হাতের রিভলভার ছিটকে পড়লো দূরে।

ভোলানাথ ভীম গর্জনে গর্জে উঠলো—তুমি কে?

আমি দস্যু বনহুর! কথা শেষ করার সঙ্গেসঙ্গেই তার হাতের চাবুকখানা ভোলানাথের শরীরে এসে পড়লো।

ভোলানাথ আর্তচীৎকার করে উঠলো— গ্রেপ্তার করো।

বনহুরের চাবুক তখন পর পর সবুজ পোশাকওয়ালা লোকগুলির দেহে সপাং করে পড়ছে।

কেউ যে মেঝে থেকে রিভলভার কুড়িয়ে হাতে তুলে নেবে, তার অবসর পাচ্ছেনা।

বনহুরের হাতে শংকর মাছের চাবুক যেন বিদ্যুতের মত চম্‌কাচ্ছে।

এবার সবুজ পোশাক পরিহিত লোকগুলি পালাবার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলো কিন্তু পথের মুখে গুলী ভরা রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে রহমান। তার শরীরেও কালো পোশাক।

বনহুর এবং রহমানের শরীর কালো পোষাকে আচ্ছাদিত থাকলেও কারো মুখে আবরণ ছিলো না।

এতো যন্ত্রণার মধ্যেও নূরীর মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, চোখ দুটোতে আনন্দ যেন ঝরে পড়তে লাগলো। সে বারবার তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে, ভাবছে সে তো স্বপ্ন দেখছে না।

বনহুরের তখন কোন দিকে খেয়াল নেই চাবুকের আঘাতে ভোলানাথ ডাকুকে কাবু করা এবং তার শয়তান পঞ্চ অনুচরদের ধরাশায়ী করাই তার কাজ।

পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে রহমান,হাতে গুলী ভরা উদ্যত রিভলভার।

বনহুরের চাবুকের আঘাতে ভোলানাথ আর তার পঞ্চ সহচর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। এক এক জনের জামা কাপড় ছিড়ে পিঠের চামড়া কেটে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। বনহুরের চাবুক তবু থামতে চায়না।

দক্ষিণ হস্তে চাবুক চালাচ্ছে। আর পা দিয়ে রিভলভারগুলো সরিয়ে দিচ্ছে বনহুর রহমানের দিকে।

বনহুরের হস্তে শংকর মাছের লেজের চাবুক কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবু করে ফেললো ভোলানাথ ও তার পঞ্চ সহচরগণকে। সবাই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বিলাপ করছে রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে ওদের দেহ। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃতের ন্যায় নির্জীব হয়ে পড়লো ভোলানাথ ও তার সহচরগণ।

বনহুর এবার শংকর মাছের চাবুকখানা ছুড়ে ফেলে দিলো, তারপর দ্রুত হস্তে তুলে নিলো নূরীকে হাতের উপর।

বনহুর নূরীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। রহমান রিভলভার উদ্যত করে ধরে রইলো ভোলানাথ ও তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে।

তাজের পিঠে বনহুর নূরীকে তুলে নিলো।

তাজ উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

নূরীর হাত পা বন্ধন অবস্থায় থাকায় বনহুর নূরীকে বাম হস্তে আঁকড়ে ধরে ছিলো শক্ত করে। দক্ষিণ হস্তে তাজের লাগাম এটে ধরে চালনা করছিলো।

এই বিপদ মুহূর্তেও এতো কষ্টের মধ্যে নূরীর হৃদয়ে আনন্দের বান বয়ে যাচ্ছিলো, মুক্তির আনন্দে আনন্দিত নয় সে, আনন্দ তার হুরের বুকে আশ্রয় পেয়েছে। এ যে সে কল্পনাও করতে পারেনি, তার হুরকে আবার ফিরে পাবে।

ভুলে গেছে নূরী তার সব যন্ত্রণা। কিছু পূর্বে শংকর মাছের চাবুকের আঘাতে পিঠের চামড়া কেটে রক্ত ঝরে পড়ছিলো, ক্ষুধা পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, তবু এতোটুকু যেন বেদনা নেই তার মধ্যে। বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে একবার ডাকলো নূরী—হুর।

বনহুর নূরীর কথায় বললো—খুব কষ্ট হচ্ছে নূরী?

না।

বনহুর পুনরায় বলে—সামনের জঙ্গলে নেমে তোমার হাত পার বন্ধন মুক্ত করে দেবো।

আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না হুর। আমার সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে।

তাজের পিঠে বনহুর আর নূরীর মধ্যে এর বেশী আর কোন কথা হলো না।

নূরী অবশ্য আর একবার প্রশ্ন করেছিলো—রহমান কোথায়? সেও কি তোমার সঙ্গে এসেছে?

বনহুর ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিলো সংক্ষেপে—রহমানও আসছে।

সম্মুখের জঙ্গলে যখন বনহুর নূরীকে নিয়ে পৌঁছলো তখন রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

তাজের পিঠে থেকে নূরীকে নামিয়ে নিলো বনহুর। তারপর নিজের কোমরের বেল্ট থেকে ধারালো ছুরি বের করে ওর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিলো।

নূরী ভুলে গেলো সমস্ত দুনিয়া! বনহুর তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলো এবং সেই কারণেই সে আজ রহমানের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে সুদূর আরাকান শহরে। নূরী বিস্মৃত হলো সব কথা! তার হাত-পার বাঁধন

মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে বনহুরের বুকে। কত দিন পর যেন খুঁজে পেয়েছে তার আপন জনকে।

বনহুরের বাহুবন্ধনে আত্মসমর্পণ করলো নূরী।

বনহুরের প্রশস্ত বক্ষে মাথা রেখে ডাকলো নূরী—হুর, কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে তুমি?

গভীর আবেগে নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললো বনহুর—নূরী, তুমি আজও আমাকে ভুলতে পারলে না?

কি করে ভুলবো? তোমার স্মৃতি আমাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দেয় তোমার কথা। জীবন থাকতে তোমাকে আমি কোন দিন ভুলবো না।

নূরী! বনহুর নূরীর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে চলে, আবেগভরা কণ্ঠে ডাকে।

নূরী বলে—হুর, তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে, তাই করো, তবু তোমার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছন্ন করো না।

নূরী আর বনহুর একটা গাছের তলায় এসে বসে। বনহুরের হাতের মুঠোয় নূরীর হাতখানা। বনহুর নূরীর কপাল থেকে বাম হস্তে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললো—নূরী, তুমি জানো—আমি কোনদিন তোমাকে সুখী করতে পারবো না তবু কোনো তুমি আমার কথা ভেবে নিজের জীবনটা বিনষ্ট করে দিলে!

নারীর স্বামীই যে সব—এ কথা তুমি জানো না? তোমার প্রতি আমার ধ্যান-জ্ঞান স্বপন সাধনা।

নূরী!

তুমি বিশ্বাস করো, আজও আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করতে পারেনি। তুমিই যে আমার সব। হুর, কলেমা পাঠ করে বা লৌকিকতার আড়ম্বর করে বিয়ে না হলেও তুমিই আমার স্বামী।

নূরী, তুমি তো জানো—বিয়ে আমি করেছি। তবুও তুমি,......

শত বিয়ে করলেও তুমি আমাকে অস্বীকার করতে পারবে না, আমি তোমার কেউ নই।

নূরী, তুমি জেনেশুনেও এ ভুল্ করবে?

ভুল আমি করিনি, করবো না আমি জানি—তুমিই আমার স্বামী। আকাশ সাক্ষী আছে—বাতাস সাক্ষী আছে। বনের পাখীরা জানে তোমার-

আমার সম্বন্ধ। হুর, তুমি যতই আমাকে দূরে সরিয়ে দাও কিন্তু পারবে না আমাকে অস্বীকার করতে।

নূরী......

না না, আমি শুনবো না কোন কথা। তুমি মনিরাকে বিয়ে করছো; তাতে আমার দুঃখ নেই। সেও আমার মতই একজন নারী। তাকে আমি বঞ্চিত করতে চাই না—তুমি যেমন আমার, তেমনি মনিরার। হুর, তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না। আর যদি তোমাকে সত্যি আমার হারাতে হয় তবে বলো এই মুহূর্তে আমি সংসার থেকে বিদায় নেই.....

নূরী দ্রুত হস্তে বনহুরের কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা খুলে নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দিতে গেলো—বলো, তোমার জন্য আমি সব পারবো।

বনহুর খপ্ করে নূরীর হাত ধরে ফেললো—নূরী ক্ষান্ত হও।

না, তুমি আমাকে কথা দাও।

নূরীর শুকনো মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে বনহুরের হৃদয় কেঁপে উঠলো! রুক্ষ চুল ললাটের এক পাশে শুকনো রক্ত জমে আছে। পিঠের চামড়া কেটে রক্ত রাঙ্গা হয়ে উঠেছে ছিন্ন বসন। বনহুর এবার নিজকে সংযত রাখতে পারলো না, তার মুখোভাব গম্ভীর হয়ে উঠলো।

নূরী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো আবার—তুমি সব পার এটুকু পারো না? একটা জীবন রক্ষার জন্য তুমি গ্রহণ করতে পারো না আমাকে?

নূরী, যা সম্ভব নয় কি করে তা হয় বলো!

দুনিয়ায় এমন কোন কাজই নেই যা সম্ভব নয়! সর্দার, নূরীকে আপনি বাঁচান। কথাটা বলতে বলতে রহমান এসে দাঁড়ায় সেখানে।

বনহুর আর নূরী সরে বসে দু'জনার কাছ থেকে।

রহমান বলে— সর্দার, একবার তাকিয়ে দেখুন নূরীর মুখের দিকে। শুধু আপনার জন্যই আজ তার জীবন বিনষ্ট হতে চলেছে। নূরী ফূলের মতই পবিত্র—নিষ্পাপ। শত চেষ্টার পরও কেউ তাকে পায়নি। সর্দার আপনি অবুঝ নন। এতোটুকু চিন্তা করে দেখুন কি আপনার কর্তব্য।

রহমান।

সর্দার, আমি আপনার গোলাম। জানি আপনি কি বলতে চাইছেন? আমি নিজে আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি নূরীর জীবন রক্ষার জন্য তাকে গ্রহণ করুন।

বনহুর এবার নিজের অলক্ষ্যে নূরীর মুখের দিকে তাকালো।

নূরী অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

রহমান এগিয়ে আসে, নূরীর হাতখানা তুলে নিয়ে বনহুরের হাতখানা তুলে ধরে, তারপর বনহুরের হাতের উপর তুলে দেয় নূরীর হাত—আমি আল্লাকে স্বাক্ষী রেখে নূরীকে সমর্পণ করলাম। আপনি কোন দিন ওকে দূরে সরিয়ে দেবেন না... রহমানের গলা চাপা কান্নায় আটকে এলো।

রহমান মথা নত করে সরে গেলো—আমি চললাম, মনি হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

বনহুর আর নূরী তাকিয়ে রইলো রহমানের চলে যাওয়া পথের দিকে। ভোর সূর্য তখন পূর্ব আকাশে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

দূর থেকে ভেসে আসছে জঙ্গলী মোরগের ডাক।

নূরী ছিন্নমলিন বেশ; রক্তমাখা শরীর, বনহুরের হাতে তার হাত। নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে সে বনহুরের মুখের দিকে।

এতোক্ষণে বনহুরের সম্বিৎ যেন ফিরে এলো, তাকাঁলো সে নূরীর মুখে।

এমন করে কোন দিন বুঝি ওদের দৃষ্টি বিনিময় হয়নি। আজ উভয়ের কাছে উভয়ে নিবিড় এত সম্বন্ধে আবদ্ধ।

বনহুর নূরীকে টেনে নিলো কাছে।

নূরীর আজ নেই কোন দ্বিধা, নিজকে সে বিলিয়ে দিলো বনহুরের বাহু বন্ধনে।

❑

বনহুরের কোলে নূরীর মাথাটা, বনহুর নূরীর চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

নূরী চোখ দুটো বন্ধ করে শুয়েছিলো নিশ্চুপ।

বনহুর বললো—তুমি আমার অপূর্ব জীবনের পরম এক সম্পদ। নূরী, তোমাকে সুখী করাই আমার কামনা।

নূরী চোখ মেলে তাকালো—এখন আমার মরলেও দুঃখ নেই। হুর, আর তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না।

নূরী বনহুরের কণ্ঠ দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো, চোখে তার আনন্দ অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। এতো আনন্দ আর বুঝি তার কোন দিন হয়নি, হৃদয়ে তার খুশীর উৎস।

নূরী আজ বনহুরের বুকে মাথা রেখে ভুলে গেলো সমস্ত দুনিয়াটাকে। হুরকে আজ সে অতি আপন করে পেয়েছে, যেমন করে সে কোন দিন পায়নি। বনহুরের বুকে নিজকে সমর্পণ করে নূরী আজ তার নারী জীবন সার্থক করে।

শিশুকালের সপ্নসাধ আজ তার পূর্ণ হয়েছে। বনহুরকে একান্ত নিজের করে পাবে—এটাই ছিলো তার জন্ম জন্মান্তরের কামনা। সে সাধ নূরীর পূর্ণ হয়েছে।

এদিকে নূরী যখন বনহুরকে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা তখন ভোলানাথের দল চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ভোলানাথের দলে লোকসংখ্যা ছিলো প্রচুর। তার সঙ্গি সবুজ পোশাক পরিহিতা পঞ্চদলের এক এক জনের দলে ছিলো হাজারেরও বেশী লোক।

ভোলানাথের আদেশে পঞ্চদল তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো—জীবিত বা মৃত ঐ যুবতীটিকে তাদের চাই। ভোলানাথ দশ হাজার টাকা তাকে বখশীস দেবে, যে তার মৃতদেহটা পৌছাতে পারবে তাদের আড্ডায়।

সমস্ত শহরে গ্রামে-বন্দরে, বন জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে কোথাও বাকী রইলো না, এমন কি প্রত্যেকটা বাড়ীঘর; দালান-কোঠায় গুপ্ত অনুচর নূরীর সন্ধান করে ফিরতে লাগলো বনে বনে শিকারীর বেশে তীর-ধনু হাতে ঘুরতে লাগলো ভোলানাথের দল। নৌকার মাঝি হয়ে কেউ নৌকা বাইতে লাগরো, কেউ বা জেলে সেজে নদীতে মাছ ধরছে, কেউ চৌকিদার সেজে রাতে অন্ধকারে গ্রামের পথে পথে হেঁকে বেড়াচ্ছে। সবাই ওরা নূরীকে দেখেছে, কাজেই চিনতে কারো ভুল হবেনা।

ডাকু ভোলানাথ যত ভয়ঙ্কর তার চেয়ে বেশী সাংঘাতিক তার অনুচর আর দলবল।

ধরতে গেলে সারা আরাকান শহরে ছড়িয়ে আছে এইসব শ্বাপদের দল। সমস্ত আরাকানটা যেন এই সব লোকদের পায়ের তলায় দলিত-মথিত হয়ে বেঁচে আছে কোনরকম। গোটা শহরে তাই নেই কোন শৃঙ্খলা বা কোন আইন -কানুন।

বিচার বলে কিছু নেই এ শহরে, আছে শুধু অন্যায় আচরণ আর অনিয়ম।

পুলিশ আছে—তারাই ভোলানাথের দলকে দেখে ভয় পায়। কারণ পুলিশের অস্ত্রের শক্তির চেয়ে এ সব শয়তানদের মস্তিষ্কের শক্তি অনেক বেশী। কোন পুলিশ যদি ভোলানাথের কোন অনুচরকে গ্রেপ্তার করে বা কোন রকম কঠিন শাস্তি দেয় তাহলে পরদিন দেখা গেছে সেই পুলিশের ছিন্ন মস্তক পথের ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, বা তার দেহটা জুল্‌ছে কোন গাছের ডালে।

তাই কেউ সাহস পায় না ভোলানাথের অনুচরদের কুকর্মে বাধা দেয়।

ইচ্ছামত ওরা শহরময় লুট-তরাজ, চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি করে বেড়ায়। এই সব শয়তানদের ভয়ে দেশে কোন সাধু ব্যক্তি বাস করতে পারে না। যারা ধনবান ভদ্র, তারা অন্য দেশে পালিয়ে গিয়ে ব্যবসা করেন, ঘর বাঁধেন, বা চাকরী করেন।

অদ্ভুত এই আরাকান শহর।

বাংলাদেশ ছেড়ে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে পাথার আর পর্বতে ঘেরা মস্ত বড় এ শহর।

বনহুর আর নূরী এই আরাকান শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের এক জঙ্গলে তখন হাসি আর গানে মেতে উঠেছে।

নূরী ছেঁড়ে জামাটায় বনহুর গিট দিয়ে দেয়। চুলগুলি আংগুলে ঠিক করে দিয়ে বলে—নূরী, একটা গান শোনাবে? সেই গান, যে গান তুমি আগে গাইতে?

নূরী গান গায়।

বনহুর নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। ছিন্ন বসনে, এলোমেলো চুলে, ক্ষত-বিক্ষত দেহে অপূর্ব সুন্দর লাগছিলো নূরীকে।

নূরী আজ পূর্বের ন্যায় উচ্ছল হয়ে উঠেছে। নাচে, গায়, ছুটোছুটি করে বেড়ায়। বন্যফুলে বিনি সূতায় মালাগাঁথে, পরিয়ে দেয় সে বনহুরের গলায়।

বনহুর বনের গাছ থেকে ফল পেড়ে নূরীর মুখে তুলে দেয়।

নূরী নিজে খায়, বনহুরকে খেতে দেয়।

বনহুরের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঝরণার পাশে। পাহাড়িয়া নদী কুল কুল করে বয়ে চলেছে, নূরী হাটু পানিতে নেমে পানি ছড়িয়ে দেয় বনহুরের গায়ে, চোখে-মুখে।

হাসে বনহুর—ধরতে যায় ওকে।

নূরী ঝাপিয়ে পড়ে পানিতে।

বনহুর ওকে আর ধরতে পারে না।

নূরী হাসে।

বনহুর আর নূরী যেন ফিরে পায় তাদের সেই ছোট বেলায় হারানো জীবন।

বনহুরের গাম্ভীর্য দূর হয়ে যায় নূরীর কাছে।

আরাকান জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে নূরীর গানের সুর প্রতিধ্বনি জাগায়। আকাশে-বাতাসে জাগায় শিহরণ। পাখীরা সুর হারিয়ে ফেলে নূরীর সুরের মাধ্যমে।

নূরী ঝরণার পানিতে সাঁতার কাটে—হাসে, গান গায়।

বনহুর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে—এসো ফিরে যাই।

নূরী পানিতে গলা অবধি ডুবিয়ে বলে—উঁহুঁ যাবোনা।

আমি তাহলে যাই। বলে বনহুর।

নূরী বলে—যাও দেখি কেমন করে যেতে পারো।

বনহুর অগত্যা ঝরণার তীরে একটা উঁচু জায়গায় বসে পড়ে।

নূরী হাতছানি দিয়ে ডাকে—এসো সাঁতার কাটি।

বনহুর হেসে বলে—পারিনা!

নূরী উঠে আসে—বনহুরের হাত ধরে টেনে নামিয়ে নেয়; খিল খিল করে হাসে।

❑

ভোলানাথ স্বয়ং তার কয়েকজন অনুচরসহ এই জঙ্গলে এসে পড়ে। তাদের প্রত্যেকের হস্তে সুতীক্ষ্মধার ছোরা আর তীর-ধনু।

সকলের দেহেই সবুজ রং এর পোশাক।

মাথায় অদ্ভুত ধরণের টুপি আর গালপাট্টা বাধা। এক এক জনের চোখ যেন আগুনের গোলার মতো জ্বলছে।

মুখ কঠিন, লোহার ইস্পাতের মত শরীর। দেখলে সাক্ষাৎ যম বলে মনে হয়।

ভোলানাথ প্রত্যেকটা জঙ্গলে নূরীর অনুসন্ধান করে ফিরছে।

সে জানে—তাদের আরাকান থেকে যুবতী এখনও বাইরে যেতে পারেনি। ভোলানাথের জ্যোতিষি বলেছে—তোমার আকাঙ্খিত নারী কোন জঙ্গলে অবস্থান করছে। সে এখনও আরাকানের মাটি ত্যাগ করেনি। ভোলানাথ তাই জ্যোতিষীর বাক্য শিরোধার্য করে বেরিয়ে পড়েছে জঙ্গলে জঙ্গলে তার অনুসন্ধান করতে।

ভোলানাথ তার দলবলসহ প্রতিটি ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালা শাখা-প্রশাখা অনুসন্ধান করে চলেছে। এতোটুকু জায়গা তারা বাদ দিয়ে যাচ্ছে না, যদি সেখানে আত্মগোপন করে থাকে যুবতী আর তার সঙ্গী।

আসলে ভোলানাথের প্রতিহিংসা, যাকে সে পাবেনা তাকে সে কিছুতেই অন্যের ভোগের সামগ্রী হতে দেবে না।

নূরীর অপরূপ সৌন্দর্য ভোলানাথের লালসা দশগুণ বেড়ে গিয়েছিলো, যেমন করে হোক ওকে সে আত্মসাৎ করবে ভেবেছিলো। হিংস্র জন্তুর মুখের শিকার কেড়ে নিলে যে অবস্থা হয় ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছে স্বয়ং ভোলানাথের।

গোটা বন তোলপাড় করে বন্য হস্তীর মত গাছপালা তচ্‌নচ্‌ করে ভোলানাথের দল এগিয়ে আসছে।

ভোলানাথ সর্বাগ্রে আর তার দল পিছনে। সূর্যের আলোতে তাদের হস্তস্থিত অস্ত্রগুলি ঝক্‌মক্‌ করে উঠছে।

কি ভয়ঙ্কর আর নৃশংস তাদের চেহারা।

বন্যপশুগণ যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। কত নিরীহ পশু জীবন দিচ্ছে ওদের হাতে।

ভোলানাথের হস্তের সুতীক্ষ্ণ তীর-ধনু।

মাথার ঝাকড়া চুলগুলো যেন সজারুর কাটার মত খাড়া হয়ে উঠছে। গোঁফ জোড়া দেখলে যে কোন সাহসী লোকেরও প্রাণ কেঁপে উঠে।

যেমন ভোলানাথের চেহারা ভয়ঙ্কর তেমনি তার কঠিন প্রাণ, এতোটুকু মায়া-মমতার লেশ নাই সেখানে। মানুষের জীবনের কোন দাম নেই ভোলানাথ বা তার দলবলের কাছে। পিপীলিকার মতই মানুষকে ওরা হত্যা করে নির্মমভাবে।

সেই ভোলানাথের শিকার হলো নূরী।

আরাকানে ভোলানাথ দেওজীর প্রতাপ এমন ছিলো—প্রত্যেকটা মানুষ তাকে ভয় করতো যমের মত। অনেকেই ভোলানাথের মূর্তি তৈরী করে পূজা করতো—শুধু কামনার জন্য নয়, প্রাণ রক্ষার জন্য।

এহেন ভোলানাথ ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত গর্জন করিতে করিতে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে তার দেহরক্ষী সহচর চক্রাকারে এগুচ্ছে।

হঠাৎ ভোলানাথের দৃষ্টি চলে গেলো দূরে ঝরণার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠে তার। সবাইকে ইংগিতে ক্ষান্ত হবার আদেশ দেয়।

ভোলানাথ চোখে দুরবীণ লাগিয়ে দেখে—দূরে, অনেক দূরে ঝরণার জলে একটি যুবতি সাঁতার কাটছে। তীরে একটা উঁচু স্থানে বসে আছে সেই লোকটি, যে তাদের শংকর মাছের চাবুকের জর্জ্জরিত করে যুবতীটিকে নিয়ে পালিয়েছিলো।

দূরবীণে যুবতীটিকে ঠিক চেনা না গেলেও যুবকটিকে চিনতে ভোলানাথের কিছুমাত্র ভুল হয়না।

হিংস্র জন্তুর মত গর্জন করে উঠে ভোলানাথ—পেয়েছি।

ভোলানাথের সহচরগণ সবাই তাকালো দূরে—অনেক দূরে ঝরণার দিকে।

ভোলানাথের দল বনহুর আর নূরীকে দেখলেও তারা দেখতে পেলোনা ওদের।

বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

নূরী সাঁতার কাটছে রাজহংসীর মত ডানা মেলে।

ঝরণার পানিতে ফুটন্ত পদ্মফুলের মত ভাসছে নূরী। অপূর্ব লাগছে আজ যেন নূরীকে। মনের আনন্দ সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে সে। নূরীর জন্ম বনে মানুষ হয়েছে সে বনে—কাজেই বনে নূরী যতখানি আনন্দ পায় ততখানি পায়না সে আর কোথাও।

নূরী আর বনহুর উভয়ে উভয়কে নিয়ে মেতে আছে, হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে ওরা।

ওদিকে ভোলানাথের দল ওৎ পেতে পেতে গাছের আড়ালে আড়ালে প্রায় ওদের কাছাকাছি এসে পড়ে।

ভোলানাথ সবাইকে, সাবধান করে দেয়—কেউ যেন নূরীর দেহে তীর না ছোড়ে।

ভোলানাথ স্বয়ং তীর-ধনু উঁচু করে ধরে বনহুরকে লক্ষ্য করে। চোখ দু'টো দিয়ে যেন আগুন ঝরে পড়ছে।

ঝরণার পানিতে সাঁতার কাটলেও নূরীর দৃষ্টি ছিলো চারিদিকে। হঠাৎ নূরীর নজর চলে গেলো দূরে গাছটার পিছনে, ভোলানাথের হস্তে উদ্যত তীর-ধনুর উপর নজর পড়তেই নূরী ছুটে এসে বনহুরকে আড়াল করে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের হস্তস্থিত তীর ধনু থেকে তীরখানা ছুটে এসে বিদ্ধ হলো নূরীর বুকে!

তীব্র একটা আর্তনাদ করে নূরী লুটিয়ে পড়লো ভূতলে। নূরীর সিক্ত বসন রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো।

বনহুর একবার নূরীর ভুলুণ্ঠিত দেহটার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফেললো সম্মুখে।

ভোলানাথ তখন তার দলবল নিয়ে হিংস্র জানোয়ারের মত গর্জন করে এগিয়ে আসছে।

পরবর্তি বই
মৃত্যুর কবলে নূরী

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই